প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

ভূমিকা

এই প্রবন্ধটি 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; এক-দলের মতে পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; দেশী জিনিসের মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। অপর দল ইহার ঠিক বিপরীত মতাবলম্বী, হিন্দুদের এবং হিন্দুসমাজের যে কোন-কিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন; আর যে পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্ত পৃথিবীময় আপনার রাজত্ব বিস্তার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা তাঁহারা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। এই প্রবল স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। স্বামীজীর এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত যথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া দিবে, এই আশা করিয়া ইহার পুনর্মুদ্রণ করা গেল।

আমরা আশা করি, শিক্ষিত বঙ্গবাসীমাত্রেই এই পুস্তকের সমাদর করিবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ইহার মূল্য যথাসম্ভব কম করা গেল।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ অনেক দিন নিঃশেষ হইয়াছিল। নানাকারণে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল। পূর্ব্বাপর হইতে এবার ইহার অধিক আদর হইবে, আশা করা যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে আমাদের দৃষ্টি নিজ দেশের প্রতি কিছু আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বদেশভক্তির মূলভিত্তি সম্বন্ধে এবং পাশ্চাত্যদেশ হইতেই বা কিরূপে তাহাদের কি কি গুণ গ্রহণ করিলে আমাদের জাতীয় উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সাধারণের একটা পরিষ্কার ধারণা নাই। কেহ কেহ পাশ্চাত্য জাতির উপর অযথা বিদ্বেষ-সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছেন। আশা করি, স্বামীজীর এই নিরপেক্ষ সমালোচনাগ্রন্থ দ্বারা লোকশিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইবে।

এবার পুস্তকখানি স্বামীজীর হস্তলিপির সহিত ভাল করিয়া মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পুস্তকপাঠের সুবিধার জন্য কতকগুলি 'মার্জিন্যাল নোট' এবং দুই-চারিটি 'ফুটনোট'ও সংযুক্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি 'পাইকা টাইপে' ও উৎকৃষ্ট মোটা 'অ্যাণ্টিক' কাগজে ছাপা হইল এবং স্বামীজীর একখানি 'হাফটোন্' চিত্র দেওয়া হইল। এই সকল কারণে ব্যয়াধিক্য হওয়া সত্ত্বেও মূল্য সামান্যমাত্র বৃদ্ধি করা হইল। ইতি—

বশংবদ

প্রকাশক

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্ম্মর প্রাসাদ ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ভগ্ন মৃন্ময় প্রাচীর জীর্ণাচ্ছাদ, দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্ন-বসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালক-বালিকা ; মধ্যে মধ্যে সমধর্ম্মী সমশরীর গো মহিষ বলীবর্দ্দ ; চারিদিকে আবর্জ্জনারাশি—এই আমাদের বর্ত্তমান ভারত।

বর্ত্তমান ভারতের বাহ্য ছবি

অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জ্জনা-স্তূপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দ্দিকে ক্ষুৎকাম জ্যোতিঃহীন-চক্ষুর কাতর দৃষ্টি—আমাদের জন্মভূমি।

বিসূচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থিমজ্জাচর্ব্বন, অনশন-অর্দ্ধাশন-সহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপ দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগশোকের কুরুক্ষেত্র, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল-পরিপ্লুত মহাশ্মশান,

পাশ্চাত্যের চক্ষে প্রাচ্য

তন্মধ্যে ধ্যানমগ্ন মোক্ষপরায়ণ যোগী,—ইউরোপী পর্য্যটক এই দেখে।

ত্রিংশকোটী মানবপ্রায় জীব—বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত-প্রাণ, দাসসুলভ-পরিশ্রম-সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশা-হীন, অতীত-হীন, ভবিষ্যৎ-বিহীন, 'যেন তেন প্রকারেণ' বর্ত্তমান প্রাণধারণমাত্র প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ চাতুরীপ্রতারণাসহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের যমস্বরূপ, বলহীন-আশাহীনের সমুচিত কদর্য্য-ভীষণকুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক-মেরুদণ্ড-হীন, পূতিগন্ধপূর্ণ-মাংসখণ্ডব্যাপি-কীটকুলের ন্যায় ভারতশরীরে পরিব্যাপ্ত—ইংরাজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি।

প্রাচ্যের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য

নববলমধুপানমত্ত হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়সহায়, ছলে-বলে কৌশলে পরদেশ-পরধনাপহরণপরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈকজীবন;—ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্য অসুর।

এই ত গেল উভয় পক্ষের বুদ্ধিহীন বহির্দৃষ্টি-লোকের

কথা। ইউরোপী বিদেশী সুশীতল সুপরিষ্কৃত সৌধশোভিত নগরাংশে বাস করেন, আমাদের 'নেটিভ' পাড়াগুলিকে নিজেদের দেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরের সঙ্গে তুলনা করেন। ভারতবাসীদের যা সংসর্গ তাঁদের হয়, তা কেবল একদলের লোক—যারা সাহেবের চাকরি করে। আর, দুঃখ দারিদ্র্য ত বাস্তবিক ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ময়লা-আবর্জ্জনা চারিদিকে ত পড়েই রয়েছে। ইউরোপী-চক্ষে এ ময়লার, এ দাসবৃত্তির, এ নীচতার মধ্যে যে কিছু ভাল থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস হয় না।

আমরা দেখি, শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছবিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ,—এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু!

দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না। বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, 'ম্লেচ্ছ' বলি,—ওরাও 'কালা দাস' বলে আমাদের ঘৃণা করে।

এ দুয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু দু দলেই ভেতরের আসল জিনিস দেখে নি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র,—ভাষা মাত্র। সেইরূপ, প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই

ভাব জগতের কার্য্য করছে—সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে-দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ইউরোপীদের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হলে সংসার চলবে না; তাই ওরা প্রবল। একেবারে নিঃশক্তি হলে কি মানুষ আর বাঁচে? জাতিটা ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র; একেবারে নিঃশক্তি নিষ্কর্ম্মা হলে জাতটা কি বাঁচবে? হাজার বছরের নানারকম হাঙ্গামায় জাতটা মলো না কেন? আমাদের রীতিনীতি যদি এত খারাপ, ত আমরা এতদিনে উৎসন্ন গেলাম না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার ত্রুটি কি হয়েছে? তবু সব হিঁদু মরে লোপাট হল না কেন—অন্যান্য অসভ্য দেশে যা হয়েছে? ভারতের ক্ষেত্র জনমানবহীন হয়ে কেন গেল না, বিদেশীরা তখুনিই ত এসে চায-বাস করে বাস করতো, যেমন আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায় হয়েছে এবং হচ্ছে? তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের

প্রত্যেক জাতির জীবনোদ্দেশ্য বিভিন্ন

সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ—যাঁরা অন্তর্ব্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং 'আমরা নরপশু, তোমরা হে ইউরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর,' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর, যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে হাসেন হোসেন করছ। ওহে বাপু, যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড় চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার কিনারা পর্য্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী—উনি চীন, জাপান পর্য্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর-মা মেরী করে কৃশ্চানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরির উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড-কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারেন নি, ও কি এখন পাদ্রী-ফাদ্রীর কর্ম্ম !! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এদেশে

চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু চারজনের জন্য দেশশুদ্ধ লোককে হাড় জ্বালাতন হতে হবে বুঝি? চরে খাওগে না কেন? এত বড় দুনিয়াটা পড়ে ত রয়েছে। তা নয়। মুরদ কোথায়? ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর নেমকহারামি করবেন, যীশুর জয় গাইবেন—আ মরি!! ঐ যে সাহেবদের কাছে নাকি-কান্না ধর যে 'আমরা অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ,' এ কথা ঠিক হতে পারে—তোমরা অবশ্য সত্যবাদী; তবে ঐ আমরার ভেতর দেশশুদ্ধকে জড়াও কেন? ওটা কোন্‌দেশী ভদ্রতা হে বাপু?

প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন কোন গুণ নেই, যা কোন জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে, কোন ব্যক্তিতে যেমন, তেমনি কোনও জাতিতে কোনও কোনও গুণের আধিক্য, প্রাধান্য।

আমাদের দেশে মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 'ধর্ম্মের'। আমরা চাই কি—'মুক্তি'। ওরা চায় কি—'ধর্ম্ম'। ধর্ম্ম-কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে।

প্রাচ্যের উদ্দেশ্য মুক্তি, পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম

ধর্ম্ম কি? যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

মোক্ষ কি? যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই। এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এ-লোকও নয়, পরলোকও নয়, তবে সে দাসত্ব— লোহার শিকল আর সোনার শিকল। তারপর প্রকৃতির মধ্যে বলে বিনাশশীল সে সুখ থাকবে না। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই। এইজন্য, ঐ যে কথা শুনেছ যে, মুক্তপুরুষ ভারতেই আছে, অন্যত্র নেই, তা ঠিক। তবে, পরে অন্যত্রও হবে। সে ত আনন্দের বিষয়। এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্ত্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্ম্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষমার্গই প্রধান হল। তাই অগ্নিপুরাণে রূপকচ্ছলে বলেছে যে, গয়াসুর (বুদ্ধ)[১] সকলকে মোক্ষমার্গ দেখিয়ে জগৎ ধ্বংস করবার উপক্রম

---

১ গয়াসুর ও বুদ্ধদেবের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর মত পরে পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি দেহত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বে কাশীধাম হইতে জনৈক শিষ্যকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে একস্থানে বলিয়াছেন :—

করেছিলেন, তাই দেবতারা এসে ছল করে তাঁকে চিরদিনের মত শান্ত করেছিলেন। ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছো ওটা ঐ ধর্ম্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম্ম অনুশীলন করে, সে ত ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে, খামকা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এদিক না ওদিক। যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, কৃশ্চান, মুসলমান, জৈন, ওদের একটা ভ্রম যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল; জাতি, ব্যক্তি প্রকৃতিভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা, জোর করে এক করতে গেলে কি হবে? বৌদ্ধরা বল্‌লে, 'মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়া-শুদ্ধ মুক্তি নেবে চল'—বলি,

ধর্ম্মলোপে ভারতের অবনতি

"অগ্নিপুরাণে গয়াসুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহাতে (যেমন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত) বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করা হয় নাই, উহা কেবল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত একটি উপাখ্যান মাত্র।

"বুদ্ধ যে গয়শীর্ষ পর্ব্বতে বাস করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ স্থান পূর্ব্ব হইতেই ছিল, প্রমাণিত হইতেছে।"

[উদ্বোধন—৮ম বর্ষ, ৫৮৮ পৃঃ]

তা কখন হয় ? 'তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম্ম কর', একথা বল্‌ছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে। কাজের কথা ? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে এক-বুদ্ধি হয়ে, একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়াচ্ছ !! হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, 'ধর্ম্মের' চেয়ে 'মোক্ষটা' অবশ্য অনেক বড়,—কিন্তু আগে ধর্ম্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেল্‌লে আর কি ! অহিংসা ঠিক, 'নির্ব্বৈর' বড় কথা ; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বল্‌ছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনমায়ান্তং'[১] ইত্যাদি, হত্যা কর্‌তে এসেছে—এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই, মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ,

---

১ গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥ ম—৮,৩৫০

আততায়ী কে—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ॥ —শুক্রনীতি

দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধাৰ্ম্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে, ঘৃণিত-জীবন যাপন কর্‌লে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য সত্য, পরমসত্য,—স্বধর্ম্ম কর হে বাপু! অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জ্জন করে, স্ত্রী-পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান কর্‌তে হবে। এ না পার্‌লে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার 'মোক্ষ' !!

ধর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি

পূর্ব্বে বলেছি যে, 'ধর্ম্ম' হচ্ছে কার্য্যমূলক। ধাৰ্ম্মিকের লক্ষণ হচ্ছে, সদা কার্য্যশীলতা। এমন কি, অনেক মীমাংসকের মতে বেদে যে স্থলে কার্য্য কর্‌তে বল্‌ছে না, সে স্থানগুলি বেদই নয়।—'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাং'—জৈমিনিসূত্র ১।২।১।—'ওঁকারধ্যানে সর্ব্বার্থসিদ্ধি,' 'হরিনামে সর্ব্বপাপনাশ,' 'শরণাগতের সর্ব্বাপ্তি', এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সাধুবাক্য অবশ্য সত্য; কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে, লাখো লোক ওঁকার জপে মচ্ছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিন রাত 'প্রভু যা করেন' বল্‌ছে, এবং পাচ্ছে—ঘোড়ার ডিম। তার

মানে বুঝতে হবে যে, কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ? কে শরণ যথার্থ নিতে পারে? যার কর্ম্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে 'ধার্ম্মিক'।

প্রত্যেক জীব শক্তিপ্রকাশের এক একটি কেন্দ্র। পূর্ব্বের কর্ম্মফলে সে শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে, আমরা তাই নিয়ে জন্মেছি। যতক্ষণ সে শক্তি কার্য্যরূপে প্রকাশ না হচ্ছে, ততক্ষণ কে স্থির থাকবে বল? ততক্ষণ, ভোগ কে ঘোচায় বল? তবে দুঃখভোগের চেয়ে, সুখভোগটা ভাল নয়? কুকর্ম্মের চেয়ে সুকর্ম্মটা ভাল নয়? পূজ্যপাদ শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন,—'ভাল মন্দ দুটো কথা, ভালটা তার করাই ভাল'।

মুক্তিকাম ও ধর্ম্মকামের আদর্শের বিভিন্নতা

এখন ভালটা কি? 'মুক্তিকামের ভাল' অন্যরূপ, 'ধর্ম্ম-কামের ভাল' আর একপ্রকার। এই গীতাপ্রকাশক শ্রীভগবান এত করে বুঝিয়েছেন, এই মহাসত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম ইত্যাদি। 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—গী, ১২।১৩—ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষকামের জন্য। আর 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—গী, ২।৩—ইত্যাদি, 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'—গী, ১১।৩৩—ইত্যাদি, ধর্ম্মলাভের উপায়, ভগবান দেখিয়েছেন! অবশ্য, কর্ম্ম করতে গেলেই, কিছু না কিছু পাপ আসবেই।

এলোই বা; উপবাসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে—জড়ের চেয়ে ভালমন্দমিশ্র কর্ম্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। সত্ত্বপ্রাধান্য অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভালমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে, এই সত্ত্ব-প্রধান হয়েছে, কি তমঃপ্রধান হয়েছে, কি করে বুঝি বল? সুখদুঃখের-পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, এ কথার জবাব দাও,—নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়,—'ফলেন পরিচীয়তে'। সত্ত্ব-প্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্তি মহাবীর্য্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মত হাত পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ, সর্ব্বলোকপূজ্য; তাঁকে কি আর 'পূজা কর' বলে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে হয়? জগদম্বা তাঁর কপালফলকে

নিজের হাতে লিখে দেন যে, এই মহাপুরুষকে সকলে পূজা কর আর জগৎ অবনত মস্তকে শোনে। সেই মহাপুরুষই 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' ইত্যাদি। আর ঐ যে মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে, ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জ্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই ত ভগবান্ এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায় ? প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—শেষ, 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'। ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশশুদ্ধ পড়ে কতই 'হরি' বলছি, ভগবানকে ডাক্‌ছি, ভগবান্ শুনছেনই না, আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না,—তা ভগবান্। এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' ; 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'।

এখন চলুক পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের কথা। প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীদের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্ব্বৈর হও, একগালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম্ম বন্ধ কর, পোঁটলা পুঁটলী

বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দু চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে।

পাশ্চাত্য জাতি কৃষ্ণের ও প্রাচ্য জাতি যীশুর উপদেশের অনুসরণ করিতেছে

আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্ব্বদা কার্য্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। 'কিন্তু উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হলো ; ওরা ইউরোপীরা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌লে না। সদা মহারজোগুণ, মহা-কার্য্যশীল, মহা উৎসাহে দেশদেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ কর্‌ছে। আর, আমরা কোণে বসে, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাব্‌ছি, 'নলিনীদলগত-জলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্'[১] গাচ্ছি ; আর যমের ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগ্‌ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে। গীতার উপদেশ শুন্‌লে কে ? না—ইউরোপী। আর যীশুখৃষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে ? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা !! একথাটা বুঝ্‌তে হবে। মোক্ষমার্গ ত প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তারপর বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব ঐখান থেকেই ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী,—অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ

---

১ শঙ্কর-কৃত মোহমুদ্গর। ৫

করুণ এব চ—বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে, জোর করে দুনিয়াশুদ্ধকে ঐ মোক্ষ মার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘসে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পিরীত কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বল,—কিছুই নয়। 'হয় মোক্ষ পাবে বল, নয় তুমি উৎসন্ন যাও' এই দুই কথা! মোক্ষ ছাড়া যা কিছু চেষ্টা করবে, সে আটঘাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ করবে তার কোনও রাস্তা নাই, বরং প্রতিপদে বাধা। কেবল বৈদিক ধর্ম্মে এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপায় আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্ব্বনাশ; যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্ব্বনাশ!!! তারপর, ভাগ্যফলে ইউরোপী-গুলো প্রটেষ্টাণ্ট (Protestant) হয়ে যীশুর ধর্ম্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্ম্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্ব্বর্গের সমন্বয়স্বরূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্ত্তন কল্লেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হল। তবে ভারতবর্ষে ত্রিশ ক্রোর লোক, দেরী হচ্ছে। ত্রিশ ক্রোর লোককে চেতানো কি একদিনে হয়?

বৌদ্ধধর্ম্মের আর বৈদিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত, ত

আমাদের এ সর্ব্বনাশ কেন হল ? 'কালেতে হয়' বললে কি চলে ? কাল কি কার্য্যকারণসম্বন্ধ ছেড়ে কাজ করতে পারে ?

অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও উপায়হীনতায় বৌদ্ধরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে। বৌদ্ধবন্ধুরা চটে যাও, যাবে; ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। সত্যটা বলা উচিত। উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়,—'জাতিধর্ম্ম', 'স্বধর্ম্ম', যেটি বৈদিক ধর্ম্মের, বৈদিক সমাজের ভিত্তি। আবার অনেক বন্ধুকে চটালুম, অনেক বন্ধু বল্‌ছেন যে, এদেশের লোকের খোশা-মুদি হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের জন্যে বলে রাখা যে, দেশের লোকের খোশামোদ করে আমার লাভটা কি ? না খেতে পেয়ে মরে গেলে দেশের লোকে একমুঠো অন্ন দেয় না ; ভিক্ষে শিক্ষে করে, বাইরে থেকে এনে, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অনাথকে যদি খাওয়াই, ত তার ভাগ নেবার জন্য দেশের লোকের বিশেষ চেষ্টা, যদি না পায়, ত গালাগালির চোটে অস্থির !! হে স্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলি ! এই আমাদের দেশের লোক, তাদের আবার কি খোশামোদ ? তবে তারা উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদকে যে ঔষধ খাওয়াতে যাবে, তার হাতে দু দশটা কামড় অবশ্যই উন্মাদ দেবে ; তা সয়ে যে ঔষধ খাওয়াতে যায়, সেই যথার্থ বন্ধু। এই 'জাতিধর্ম্ম', 'স্বধর্ম্মই' সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায়, মুক্তির সোপান। ঐ 'জাতিধর্ম্ম' 'স্বধর্ম্ম'

স্বধর্ম্ম রক্ষাই জাতীয় কল্যাণের উপায়

নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম সিধুরাম যা জাতিধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম বলে বুঝেছেন, ওটা উল্টো উৎপাত; নিধু জাতিধর্ম্মের ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন, ওঁর গাঁয়ের আচারকেই সনাতন আচার বলে ধারণা কচ্ছেন, নিজের কোলে ঝোল টানছেন, আর উৎসন্ন যাচ্ছেন। আমি গুণগত জাতির কথা বলছি না, বংশগত জাতির কথা বলছি, জন্মগত জাতির কথা বলছি। গুণগত জাতিই আদি, স্বীকার করি; কিন্তু, গুণ দু চার পুরুষে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। সেই আসল জায়গায় ঘা পড়ছে, নইলে সর্ব্বনাশ হল কেন? 'সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।'[১] কেমন করে এ ঘোর বর্ণসাঙ্কর্য্য উপস্থিত হল, সাদা রং কাল কেন হল, সত্ত্বগুণ রজোগুণপ্রধান—তমোগুণে কেন উপস্থিত হল, সে সব অনেক কথা, বারান্তরে বলবার রইল। আপাততঃ এইটি বোঝ যে, জাতিধর্ম্ম যদি ঠিক ঠিক থাকে, ত দেশের অধঃপতন হবেই না। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমাদের অধঃপতন কেন হল? অবশ্যই জাতিধর্ম্ম উৎসন্নে গেছে। অতএব যাকে তোমরা জাতিধর্ম্ম বল্‌ছ, সেটা ঠিক উল্টো। প্রথম পুরাণ পুঁথি পাটা বেশ করে পড়্‌গে, এখনিই দেখ্‌তে পাবে যে, শাস্ত্র যাকে জাতিধর্ম্ম

---

১ গীতা, ৩।২৪

বল্‌ছে, তা সর্ব্বত্রই প্রায় লোপ হয়েছে। তারপর, কিসে সেইটি ফের আসে, তারি চেষ্টা কর ; তা হলেই পরম কল্যাণ নিশ্চিত। আমি যা শিখেছি, যা বুঝেছি, তাই তোমাদের বল্‌ছি ; আমি ত আর বিদেশ থেকে তোমাদের হিতের জন্য আমদানী হই নি যে, তোমাদের আহাম্মকিগুলিকে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে ? বিদেশী বন্ধুর কি ? বাহবা লাভ হলেই হল। তোমাদের মুখে চুণকালী পড়্‌লে যে আমার মুখে পড়ে,—তার কি ?

পূর্ব্বেই বলেছি যে, প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতি নীতি, সেই উদ্দেশ্যটি সফল কর্‌বার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবনে ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত রীতি নীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতি নীতিগুলির হ্রাস বৃদ্ধিতে বড় বেশী এসে যায় না ; কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।

জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিতে আঘাত পড়িলেই বিপ্লব বা জাতীয় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী

ছেলেবেলায় গল্প শুনেছ যে, রাক্ষসীর প্রাণ একটা পাখীর মধ্যে ছিল। সে পাখীটার নাশ না হলে, রাক্ষসীর কিছুতেই নাশ হয় না ; এও তাই। আবার দেখবে যে, যে

অধিকারগুলো জাতীয় জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, সে অধিকারগুলো সব যাক না, সে জাতি বড় তাতে আপত্তি করে না, কিন্তু যখন যথার্থ জাতীয় জীবনে ঘা পড়ে, তৎক্ষণাৎ মহাবলে প্রতিঘাত করে।

ফরাসী, ইংরাজ ও হিন্দুর দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত তত্ত্ব সমর্থন

তিনটি বর্ত্তমানজাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস তোমরা অল্পবিস্তর জান—ফরাসী, ইংরেজ, হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রজারা সব অত্যাচার অবাধে সয়, করভারে পিষে দাও, কথা নেই; দেশশুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই কর, আপত্তি নেই; কিন্তু যেই সে স্বাধীনতার উপর হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেউ কারুর উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পাবে না, এইটিই ফরাসীচরিত্রের মূলমন্ত্র। 'জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ বংশ, নীচ বংশ, রাজ্য শাসনে সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার!' এর উপর হাত কেউ দিতে গেলেই তাঁকে ভুগতে হয়।

ইংরাজচরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি আদান প্রদান, প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ, ইংরাজের আসল কথা। রাজা, কুলীনজাতি-অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয়, ত তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে, বেশ কথা—মান্য করি, কিন্তু

টাকাটি যদি তুমি চাও ত তার কার্য্য কারণ হিসাব পত্রে আমি দু কথা বল্‌ব বুঝ্‌ব, তবে দেব। রাজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন; রাজাকে মেরে ফেল্‌লে।

হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা, বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্চে পারমার্থিক স্বাধীনতা —'মুক্তি'। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বল, সব ঐখানে এক মত। ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্ব্বনাশ; তা ছাড়া যা কর, চুপ করে আছি। লাথি মার, 'কাল' বল, সর্ব্বস্ব কেড়ে লও—বড় এসে যাচ্ছে না; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ। এই দেখ, বর্ত্তমানকালে পাঠান বংশরা আস্‌ছিল যাচ্ছিল, কেউ সুস্থির হয়ে রাজ্য করতে পাচ্ছিল না; কেন ন', ঐ হিঁদুর ধর্ম্মে ক্রমাগত আঘাত কচ্ছিল। আর মোগল রাজ্য কেমন সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হল।—কেন? না মোগলরা ঐ জায়গাটায় ঘা দেয় নি। হিঁদুরাই ত মোগলের সিংহাসনের ভিত্তি— জাহাঙ্গীর, সাজাহান, দারাসেকো, এদের সকলের মা যে হিঁদু। আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, অমনি এত বড় মোগল রাজ্য স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল। ঐ যে ইংরাজের সুদৃঢ় সিংহাসন, এ কিসের উপর?

ঐ ধর্ম্মে হাত কিছুতেই দেয় না বলে। পাদরী-পুঙ্গবেরা একটু আধটু চেষ্টা করেই ত '৫৭ সালের হাঙ্গামা উপস্থিত করেছিল। ইংরাজরা যতক্ষণ এইটি বেশ করে বুঝবে এবং পালন করবে, ততক্ষণ ওদের 'তকত তাজ অচল রাজধানী।' বিজ্ঞ বহুদর্শী ইংরাজেরাও একথা বোঝে, লর্ড রবার্টসের 'ভারতবর্ষে ৪১ বৎসর' [১] নামক পুস্তক পড়ে দেখ।

এখন বুঝতে পারছ ত, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি কোথায়?—ধর্ম্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারে নি বলেই, জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে। আচ্ছা, একজন দেশী পণ্ডিত বলছেন যে, ওখানটায় প্রাণটা রাখবার এত আবশ্যক কি? সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় রাখ না কেন?—যেমন অন্যান্য অনেক দেশে। কথাটি ত হল সোজা, যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মিথ্যা, তা হলেও কি দাঁড়ায়, দেখ। অগ্নি ত এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই মহা-শক্তির প্রেরণায় শতাব্দী কতক নানা সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে, ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তারি

১ Forty-one Years in India—৩০ ও ৩১ অধ্যায়।

প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্ত্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ। বলি, আমাদের লাখো বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা, না তোমার বিদেশীর দু পাঁচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা? ইংরেজ কেন ধর্ম্মপ্রাণ হক না, মারামারি কাটা-কাটিগুলো ভুলে শান্ত শিষ্টটি হয়ে বসুক না?

আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে, ত ইদিক উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন করে হক্, সমুদ্রে যাবেই, দু দিন আগে বা পরে, দুটো ভাল জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে ত আর ত এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই ত নয়।

ধর্ম্মব্যতীত অপর কিছুতেই ভারতের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব

কিন্তু এ বুদ্ধিটি আগা পাস্তলা ভুল, মাপ করো, অল্পদর্শীর কথা। দেশে দেশে আগে যাও এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তার পর যদি মাথা থাকে ত ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরাণ পুঁথি পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশদেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চোখে

নয়, সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক্ ধক্ করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এ দেশের প্রাণ ধর্ম্ম, ভাষা ধর্ম্ম, ভাব ধর্ম্ম ;— আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটান, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে, তাই হবে, অর্থাৎ ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে হয় ত হবে ; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র !

তা ছাড়া উপায় ত সব দেশেই সেই এক, অর্থাৎ গোটাকতক শক্তিমান্ পুরুষ যা করছে, তাই হচ্ছে ; বাকি-গুলো খালি 'ভেড়িয়াধসান'[১] বই ত নয়। ও তোমার 'পার্লেমেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট্' দেখলুম, ভোট্, ব্যালট্, মেজরিটি, সব দেখলুম, রামচন্দ্র ! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে, সমাজকে চালাচ্ছে, বাকি-গুলো ভেড়ার দল। তবে ভারতবর্ষে শক্তিমান্ পুরুষ কে ? না, ধর্ম্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান। তাঁরাই সমাজের রীতি নীতি বদলাবার দরকার হলে বদলে দেন। আমরা চুপ করে শুনি, আর করি। তবে এতে তোমার বাড়ার ভাগ, ঐ মেজরিটি ভোট প্রভৃতি হাঙ্গামগুলো নেই, এই মাত্র।

শক্তিমান্ পুরুষই সকল সমাজের পরিচালক

---

১ ন্যায়শাস্ত্রে যাহাকে 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বলে। যেমন একটি মেষের অনুকরণে অপর মেষসমূহ তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অবশ্য ভোট ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না, কিন্তু রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই। সে ঘুষের ধূম, সে দিনে ডাকাতি যা পাশ্চাত্যদেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে, ত মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে। 'গোরস্ গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠ্ বিকায়। সতীকো না মিলে ধোতি কসবিন্ পেহনে খাসা॥'[১] যাদের হাতে টাকা তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুটোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠ্ছে শুষ্ছে, তারপর সেপাই করে দেশদেশান্তরে মর্তে পাঠাচ্ছে,—জিত হলে, তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো ত সেইখানেই মারা গেল,—হে রাম! চমকে যেও না, ভাঁওতায় ভুলো না।

পাশ্চাত্যদেশে রাজনীতির নামে দিনে ডাকাতি

একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না

---

১ গলিতে গলিতে দুগ্ধ ফেরি করিতে হয়, কিন্তু সুরা একস্থানে বসিয়াই বিক্রয় হয়। সতী নারীর পরিধানে বস্ত্র জুটে না, অসতী সুবেশ পরিধান করে। ধন্য কলিযুগের প্রভাব!

—মহাত্মা তুলসীদাস

আইনে মানুষ করে? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকা মানুষ কর্‌তে পারে? মানুষে নাম যশ করে, না নাম যশে মানুষ করে?

মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ওসব বাকি আপনা-আপনি গড়গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ ত একটা দাগ রেখে যাও। 'তুলসী যব জগমে আয়ো জগ হসে তোম্ রোয়। এ্যায়সী করনী কর্ চলো কি তোম্ হসে জগ রোয়॥'

মানুষ হও

যখন তুমি জন্মেছিলে তুলসী, সকলে হাসতে লাগলো, তুমি কাঁদতে লাগলে; এখন এমন কাজ করে চল যে, তুমি হাসতে হাসতে মরবে, আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে। এ পার, তবে তুমি মানুষ, নইলে কিসের তুমি?

আর এক কথা বোঝ দাদা,—অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে; যে জাতটে বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট! 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' তবে দেখ, জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইমাত্র। আর আসলটা সর্ব্বদা বাঁচিয়ে বাকি জিনিস শিখতে হবে। বলি, খাওয়া

ত সব দেশেই এক ; তবে আমরা পা গুটিয়ে বসে খাই, বিলাতিরা পা ঝুলিয়ে বসে খায়। এখন মনে কর যে, আমি এদের রকমে রান্না খাওয়া খাচ্ছি ; তা বলে কি এদের মত ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাকতে হবে ? আমার ঠ্যাং যে যমের বাড়ী যাবার দাখিলে পড়ে—টন্‌টনানিতে যে প্রাণ যায়, তার কি ? কাজেই পা গুটিয়ে, এদের খাওয়া খাব বৈকি। ঐ রকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে, সেটা আমাদের মত করে—পা গুটিয়ে, আসল জাতীয় চরিত্রটি বজায় রেখে। বলি, কাপড়ে কি মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পরে ? শক্তিমান পুরুষ যে পোষাকই পরুক না কেন, লোকে মানে ; আর আমার মত আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে না।

পাশ্চাত্য জাতির গুণসকল আমাদের ছাঁচে ফেলিয়া লইতে হইবে

এখন, গৌরচন্দ্রিকাটা বড্ড বড় হয়ে পড়্‌ল ; তবে দুদেশ তুলনা করা সোজা হবে, এই ভণিতার পর। এরাও ভাল,—আমরাও ভাল, 'কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দুয়ো পাল্লা ভারি।' তবে ভালর রকমারি আছে, এইমাত্র।

মানুষের মধ্যে আছেন, আমাদের মতে তিনটি জিনিস। শরীর আছেন, মন আছেন, আত্মা আছেন। প্রথম শরীরের কথা দেখা যাক, যা সকলকার চেয়ে বাইরের জিনিস।

শরীরে শরীরে কত ভেদ, প্রথম দেখ। নাক, মুখ, গড়ন, লম্বাই, চৌড়াই, রঙ, চুল, কত রকমের তফাৎ।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রঙের তফাৎ বর্ণসাঙ্কর্য্যে উপস্থিত হয়। গরম দেশ, ঠাণ্ডা দেশ ভেদে কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্য হয়; কিন্তু কাল সাদার আসল কারণ, পৈতৃক। অতি শীতল দেশেও ময়লারঙ জাতি দেখা যাচ্ছে, এবং অতি উষ্ণ দেশেও ধপ্‌ধপে ফর্‌সা জাতি বাস কর্‌ছে। কানাডানিবাসী আমেরিকার আদিম মানুষ ও উত্তরমেরুসন্নিহিত দেশনিবাসী এস্কুইমো প্রভৃতির খুব ময়লা রঙ, আবার মহাবিষুবরেখার উপরিস্থিত দ্বীপেও সাদারঙ্‌ আদিম জাতির বাস; বোর্ণিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ইহার নিদর্শন।

বর্ণভেদের কারণ

এখন আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, হিঁদুর ভেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাত এবং চীন, হূন, দরদ, পহ্লব, যবন এবং খশ্‌, এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি, এঁরা হচ্ছেন আর্য্য। শাস্ত্রোক্ত চীন জাতি, এ বর্ত্তমান 'চীনেম্যান' নয়; ওরা ত সে কালে নিজেদের 'চীনে' বল্‌তই না। 'চীন' বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তরপূর্ব্বভাগে ছিল; দরদ্‌রাও যেখানে এখন ভারত আর আফগানিস্থানের মধ্যে পাহাড়ি জাত সকল, ঐখানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির দু দশটা বংশধর এখনও

আর্য্যজাতি

আছে। দরদিস্থান এখনও বিদ্যমান। 'রাজতরঙ্গিণী' নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে বারংবার দরদ্‌রাজের প্রভুতার পরিচয় পাওয়া যায়। হূন নামক প্রাচীন জাতি অনেক দিন ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিল। এখন টিবেটিরা নিজেদের হূন বলে; কিন্তু সেটা বোধ হয় 'হিউন'। ফল মনূক্ত হূন আধুনিক তিব্বতী ত নয়; তবে এমন হতে পারে যে, সেই আর্য্য হূন এবং মধ্য আসিয়া হতে সমাগত কোন মোগ্‌লাই জাতির সংমিশ্রণে বর্ত্তমান তিব্বতীর উৎপত্তি। প্রজাবলস্কি এবং ড্যুক্‌ড অর্‌লিআঁ নামক রুশ ও ফরাসী পর্য্যটকদের মতে তিব্বতের স্থানে স্থানে এখনও আর্য্য-মুখচোখ-বিশিষ্ট জাতি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম। এই নামটার উপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে। অনেকের মতে, যবন এই নামটা 'য়োনিয়া' (Ionia) নামক স্থানবাসী গ্রীকদের উপর প্রথম ব্যবহার হয়, এজন্য মহারাজা অশোকের পালিলেখে 'যোন' নামে গ্রীকজাতি অভিহিত। পরে 'যোন' হতে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের দিশি কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে 'যবন' শব্দ গ্রীক্‌বাচী নয়। কিন্তু এ সমস্তই ভুল। 'যবন' শব্দই আদি শব্দ, কারণ শুধু যে হিঁদুরাই গ্রীকদের যবন বলত, তা নয়; প্রাচীন মিশরী ও বাবিলরাও গ্রীকদের যবন নামে আখ্যাত কর্‌ত। পহ্লব শব্দে, পেহলবি ভাষাবাদী প্রাচীন

পারসী জাতি। 'খশ্' শব্দে এখনও অর্দ্ধসভ্য পার্ব্বত্য-দেশবাসী আর্য্যজাতি; এখনও হিমালয়ে ঐ নাম ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীরাও এই অর্থে খশদের বংশধর। অর্থাৎ যে সকল আর্য্যজাতিরা প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তারা সব খশ্।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আর্য্যদের লালচে সাদা রঙ্, কাল বা লাল চুল, সোজা নাক চোখ ইত্যাদি; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ্ ভেদে, একটু তফাৎ। যেখানে রঙ কাল, সেখানে অন্যান্য কাল জাতের সঙ্গে মিশে এইটি দাঁড়িয়েছে। এদের মতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দু চার জাতি এখনও পুরো আর্য্য আছে, বাকি সমস্ত খিচুড়িজাত, নইলে কাল কেন হল? কিন্তু ইউরোপী পণ্ডিতদের এখনও ভাবা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশুর লাল চুল্ জন্মায়, কিন্তু দু চার বৎসরেই চুল ফের কাল হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।

আর্য্যজাতির গঠন ও বর্ণ

এখন পণ্ডিতেরা লড়ে মরুন! আর্য্য নাম হিঁদুরাই নিজেদের উপর চিরকাল ব্যবহার করেছে। শুদ্ধ হোক, মিশ্র হোক, হিঁদুদের নাম আর্য্য, বস্। কাল বলে ঘৃণা হয়, ইউরোপীরা অন্য নাম নিন্‌গে। আমাদের তায় কি?

হিন্দু ও আর্য্য

কিন্তু কাল হোক, গোরা হোক, দুনিয়ার সব জাতের চেয়ে এই হিঁদুর জাত সুশ্রী, সুন্দর। একথা আমি নিজের জাতের বড়াই করে বল্‌ছি না, কিন্তু একথা জগৎপ্রসিদ্ধ। শতকরা সুশ্রী নরনারীর সংখ্যা এদেশের মত আর কোথায়? তার উপর ভেবে দেখ, অন্যান্য দেশে সুশ্রী হতে যা লাগে, আমাদের দেশে তার চেয়ে ঢের বেশী; কেন না, আমাদের শরীর অধিকাংশই খোলা। অন্য দেশে কাপড় চোপড় ঢেকে, বিশ্রীকে ক্রমাগত সুশ্রী করবার চেষ্টা। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক সুখী। এ সব দেশে ৪০ বৎসরের পুরুষকে জোয়ান বলে, ছোঁড়া বলে, ৫০ বৎসরের স্ত্রীলোক যুবতী। অবশ্য এরা ভাল খায়, ভাল পরে, দেশ ভাল এবং সর্ব্বাপেক্ষা আসল কথা হচ্ছে, অল্প বয়সে বে করে না। আমাদের দেশেও যে দু একটা বলবান জাতি আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ কত বয়সে বে করে। গোর্‌খা, পাঞ্জাবী, জাঠ, আফ্রিদি প্রভৃতি পার্ব্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর। তারপর শাস্ত্র পড়ে দেখ,—৩০, ২৫, ২০—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বের বয়স। আয়ু, বল, বীর্য্য, এদের আর আমাদের, অনেক ভেদ; আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা—তিন পেরুলেই ফরসা; এরা তখন সবে গা ঝেড়ে উঠছে। আমরা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মোটামুটি প্রভেদ

হিন্দু সুশ্রী, ইউরোপীয় সুস্থকায়

নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। এরা মাংসাশী, এদের অধিক রোগই বুকে। হৃদ্রোগে, ফুস্‌ফুস্ রোগে এদের বুড়োবুড়ী মরে। একজন এদেশী বিজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু জিজ্ঞাসা করছেন যে, পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা কি প্রায় নিরুৎসাহ বৈরাগ্যবান হয়? হৃদয়াদি উপরের শরীরের রোগে আশা বিশ্বাস পুরো থাকে। ওলাওঠা রোগী গোড়া থেকেই মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়। যক্ষ্মারোগী মরবার সময় পর্য্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে, সে সেরে উঠবে। অতএব সেই জন্যেই কি ভারতের লোক সর্ব্বদাই মরণ মরণ আর বৈরাগ্য বৈরাগ্য করছে? আমি ত এখনও উত্তর দিতে পারি নাই; কিন্তু কথাটা ভাববার বটে। আমাদের দেশে দাঁতের রোগ, চুলের রোগ খুব কম। এ সব দেশে অতি অল্প লোকেরই নিজের স্বাভাবিক দাঁত। আর টাকের ছড়াছড়ি। আমরা নাক ফুঁড়ছি, কাণ ফুঁড়ছি গহনা পরবার জন্য। এরা এখন ভদ্রলোকে বড় নাক কান ফোঁড়ে না; কিন্তু কোমর বেঁধে বেঁধে, শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে, পিলে যকৃৎকে স্থানভ্রষ্ট করে শরীরটাকে বিশ্রী করে বসে। 'গড়ন গড়ন' করে এরা মরে, তায় ঐ বস্তাবন্দি কাপড়ের উপর গড়ন রাখতে হবে। এদের পোষাক কাজকর্ম্ম করবার অত্যন্ত উপযোগী; ধনী-

আমাদের মৃত্যু অধিকাংশ উদররোগে, উহাদের হৃদ্রোগে

লোকের স্ত্রীদের সামাজিক পোষাক ছাড়া, মেয়েদের পোষাকও হতচ্ছাড়া। আমাদের মেয়েদের শাড়ী, আর পুরুষদের চোগা চাপকান পাগড়ির সৌন্দর্য্যের এ পৃথিবীতে তুলনা নেই। ভাঁজ ভাঁজ পোষাকে যত রূপ, তত আটা-সাটায় হয় না। আমাদের পোষাক সমস্তই ভাঁজ ভাঁজ, কিন্তু আমাদের কাজকর্ম্মের পোষাক নেই; কাজ কর্ত্তে গেলেই কাপড় চোপড় বিসর্জ্জন যায়। এদের ফ্যাসান্ কাপড়ে, আমাদের ফ্যাসান্ গয়নায়; এখন কিছু কিছু কাপড়েও হচ্ছে। ফ্যাসান্‌টা কি, না—ঢঙ্; মেয়েদের কাপড়ের ঢঙ্—পারিস সহর থেকে বেরোয়, পুরুষদের—লণ্ডন থেকে। আগে পারিসের নর্ত্তকীরা এই ঢঙ্ ফেরাত। একজন বিখ্যাত নটী যা পোষাক পরলে, সকলে অমনি দৌড়ুল তাই কর্ত্তে। এখন দোকানীরা ঢঙ্ করে। কত ক্রোর টাকা যে এই পোষাক কর্ত্তে লাগে প্রতি বৎসর, তা আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। এ পোষাক গড়া এক প্রকাণ্ড বিদ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ মেয়ের গায়ের, চুলের রঙের সঙ্গে, কোন্ রঙের কাপড় সাজন্ত হবে; কার শরীরের কোন্ গড়নটা ঢাকতে হবে, কোন্‌টা বা পরিস্ফুট করতে হবে, ইত্যাদি অনেক মাথা ঘামিয়ে পোষাক তৈরী হয়। তারপর, দু চার জন উচ্চপদস্থ মহিলা যা পরেন, বাকি সকলকে তাই পরতে হয়,—না

পোষাক

পরলে জাত যায়!! এর নাম ফ্যাসান্! আবার এই ফ্যাসান্ ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে, বছরে চার ঋতুতে চার বার বদলাবেই ত, তা ছাড়া অন্য সময়েও আছে। যারা বড় মানুষ, তারা দরজী দিয়ে পোষাক করিয়ে নেয়; যারা মধ্য-বিৎ ভদ্রলোক, তারা কতক নিজের হাতে, কতক ছুট্‌কো ছাট্‌কা মেয়ে দরজী দিয়ে, নূতন ধরনের পোষাক গড়িয়ে নেয়। পরবর্ত্তী ফ্যাসান্ যদি কাছাকাছি রকমের হয়, ত পুরাণ কাপড় বদলে সদলে নেয়, নতুবা নূতন কেনে। বড় মানুষেরা ফি ঋতুতে কাপড়গুলি চাকর বাকরদের দান করে। মধ্যবিত্তেরা বেচে ফেলে; তখন সে কাপড়গুলি ইউরোপী লোকদের যে সমস্ত উপনিবেশ আছে,—আফ্রিকা, এসিয়া, অষ্ট্রেলিয়ায়—সেথায় গিয়ে হাজির হয়, এবং তারা পরে। যারা খুব ধনী, তাদের কাপড় পারিস হতে তৈয়ার হয়ে আসে; বাকিরা নিজেদের দেশে সেগুলি নকল করে পরে! কিন্তু, মেয়েদের টুপিটি আসল ফরাসী হওয়া চাইই চাই। যার তা নয়, সে লেডি নয়। ইংরেজের মেয়েদের আর জর্ম্মান মেয়েদের পোষাক বড় খারাপ; ওরা বড় পারিস ঢঙে পোষাক পরে না—দু দশজন বড় মানুষ ছাড়া; এইজন্য অন্যান্য দেশের মেয়েরা ওদের ঠাট্টা করে। ইংরেজ পুরুষরা কিন্তু খুব ভাল পোষাক পরে,—অনেকেই। আমেরিকার মেয়ে পুরুষ সকলেই খুব ঢঙসই পোষাক পরে।

যদিও আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট পারিস বা লণ্ডনের আমদানী পোষাকের উপর খুব মাশুল বসায়, যাতে বিদেশী মাল এ দেশে না আসে; তথাপি এরা মাশুল দিয়েও, মেয়েরা পারিস ও পুরুষরা লণ্ডনের তৈরী পোষাক পরে। নানা রকমের নানা রঙের পশমিনা, বনাত, রেশমী কাপড় রোজ রোজ বেরুচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাইতে লেগে আছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাই কেটে ছেঁটে পোষাক করছে। ঠিক ঢঙের পোষাক না হলে, জেণ্টলম্যান বা লেডীর রাস্তায় বেরুনই মুশকিল। আমাদের দেশে এ ফ্যাসানের হাঙ্গাম কিছু কিছু গহনায় ঢুক্‌ছে। এ সব দেশের পশম-রেশম-তাঁতিদের নজর দিন রাত—কি বদলাচ্ছে বা না বদলাচ্ছে—লোকে কি রকম পছন্দ করছে—তার উপর, অথবা, নূতন একটা করে লোকের মন আকর্ষণ করবার চেষ্টা কর্‌ছে। একবার আন্দাজ লেগে গেলেই, সে ব্যবসাদার বড়মানুষ। যখন তৃতীয় নেপলেঁঅ ফরাসী দেশের বাদশা ছিলেন, তখন সম্রাজ্ঞী অজেনি পাশ্চাত্য জগতের বেশভূষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর কাশ্মীরী শাল বড় পছন্দ ছিল। কাজেই লাখো টাকার শাল ইউরোপ প্রতি বৎসর কিনত। তাঁর পতন অবধি সে ঢঙ্ বদ্‌লে গেছে। শাল আর বিক্রী হয় না। আর আমাদের দেশের লোক দাগাই বুলোয়; নূতন একটা কিছু করে সময় মত, বাজার দখল কর্ত্তে

পার্লে না; কাশ্মীর বেজায় ধাক্কা খেলে; বড় বড় সদাগর গরীব হয়ে গেল। এ সংসার—দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর, কেউ কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দু'শ হাত দিয়ে দেখছে খাটছে; আমরা—'গোঁসাইজী যা পুঁথিতে' লেখেন নি—তা কখনই করবো না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার !! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা ত অষ্টরম্ভা; খালি চীৎকার হচ্ছে; বস্। কোণ থেকে বেরোও না—দুনিয়াটা কি, চেয়ে দেখ না। আপনা আপনি বুদ্ধিসুদ্ধি আসবে। দেবাসুরের গল্প ত জানই। দেবতারা আস্তিক—আত্মায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে, পরলোকে বিশ্বাস রাখে। অসুররা বলছে—ইহলোকে এই পৃথিবী ভোগ কর, এই শরীরটাকে সুখী কর। দেবতা ভাল, কি অসুর ভাল, সে কথা হচ্ছে না। বরং পুরাণের অসুরগুলোই ত দেখি মনিষ্যির মত, দেবতাগুলো ত অনেকাংশে হীন। এখন যদি বোঝ যে তোমরা দেবতার বাচ্চা আর পাশ্চাত্যেরা অসুরবংশ, তা হলেই, দুদেশ বেশ বুঝতে পারবে।

মৌলিকতা অভাবেই আমাদের অবনতি

দেখ, শরীর নিয়ে প্রথম। বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি হচ্ছে—পবিত্রতা। মাটি জল প্রভৃতির দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয়; উত্তম। দুনিয়ায় এমন জাত কোথাও নেই যাদের শরীর হিঁদুদের মত সাফ। হিঁদু ছাড়া আর কোনও জাত

জলশৌচাদি করে না। তবু পাশ্চাত্যদের, চীনেরা কাগজ ব্যবহার করাতে শিখিয়েছে—কিছু বাঁচোয়া। স্নানও নেই বললেই হয়। এখন ইংরেজরা ভারতে এসে স্নান ঢুকিয়েছে দেশে। তবুও যে সব ছেলেরা বিলেতে পড়ে এসেছে তাদের জিজ্ঞাসা কর—যে স্নানের কি কষ্ট। যারা স্নান করে—সে সপ্তায় এক দিন—সে দিন ভেতরের কাপড় অণ্ডার-ওয়ার বদলায়। অবশ্য এখন পয়সাওয়ালাদের ভেতর অনেকে নিত্যস্নায়ী। আমেরিকানরা একটু বেশী! জর্ম্মান—কালেভদ্রে ; ফরাসী প্রভৃতি কস্মিন্‌কালেও না !!! স্পেন ইতালী অতি গরম দেশ, সে আরও নয়—রাশীকৃত লসুন খাওয়া, দিনরাত ঘর্ম্মাক্ত, আর সাত জন্মে জলস্পর্শও না! সে গায়ের গন্ধে ভূতের চৌদ্দপুরুষ পালায়—ভূত ত ছেলে-মানুষ। 'স্নান' মানে কি—মুখটি মাথাটি ধোয়া, হাত ধোয়া—যা বাহিরে দেখা যায়। আবার কি! পারিস, সভ্যতার রাজধানী পারিস, রঙ্‌-ঢঙ্‌ ভোগবিলাসের ভূস্বর্গ পারিস, বিদ্যা শিল্পের কেন্দ্র পারিস, সেই পারিসে এক বৎসর এক বড় ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আনলেন। এক প্রাসা-দোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন—রাজভোগ খাওয়া-দাওয়া কিন্তু স্নানের নামটি নেই। দুদিন ঠায় সহ্য করে—শেষে আর পারা গেল না। শেষে বন্ধুকে বলতে হলো—

শরীরশুদ্ধি-বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা

দাদা, তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমায় এখন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' হয়েছে। এই দারুণ গরমীকাল, তাতে স্নান করবার জো নেই, হন্যে কুকুর হবার যোগাড় হয়েছে। তখন বন্ধু দুঃখিত হয়ে চটে বললেন যে, এমন হোটেলে থাকা হবে না, চল ভাল জায়গা খুঁজে নিইগে। ১২টা প্রধান প্রধান হোটেলে খোঁজা হলো, স্নানের স্থান কোথাও নেই। আলাদা স্নানাগার সব আছে, সেখানে গিয়ে ৪।৫ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল হরি! সে দিন বিকালে কাগজে পড়া গেল—এক বুড়ী স্নান কর্ত্তে টবের মধ্যে বসেছিল, সেইখানেই মারা পড়েছে !! কাজেই জন্মের মধ্যে একবার বুড়ীর চামড়ার সঙ্গে জলস্পর্শ হতেই কুপোকাৎ !! এর একটি কথা অতিরঞ্জিত নয়। রুশ ফুস্‌গুলো ত আসল ম্লেচ্ছ, তিব্বত থেকেই ও ঢং আরম্ভ। আমেরিকায় অবশ্য প্রত্যেক বাসাবাড়ীতে একটা করে স্নানের ঘর ও জলের পাইপের বন্দোবস্ত আছে।

কিন্তু তফাৎ দেখ। আমরা স্নান করি কেন?—অধর্ম্মের ভয়ে; পাশ্চাত্যেরা হাত-মুখ ধোয়—পরিষ্কার হবে বলে। আমাদের—জল ঢাললেই হল, তা তেলই বেড় বেড় করুক, আর ময়লাই লেগে থাকুক। আবার, দক্ষিণী ভায়া স্নান করে এমন লম্বা চওড়া তেলক কাটলেন যে, ঝামারও সাধ্য নয় তাকে ঘসে তোলে। আবার আমাদের স্নান সোজা:

কথা, যেখানে হক ডুব লাগালেই হল। ওদের—সে এক বস্তা কাপড় খুলতে হবে, তার বন্ধনই বা কি! আমাদের গা দেখাতে লজ্জা নেই; ওদের বেজায়। তবে পুরুষে পুরুষে কিছুমাত্র নেই—বাপ বেটার সামনে উলঙ্গ হবে—দোষ নেই। মেয়েছেলের সামনে আপাদমস্তক ঢাকতে হবে।

'বহিরাচার' অর্থাৎ পরিষ্কার থাকাটা, অন্যান্য আচারের ন্যায়, কখন কখন অত্যাচার বা অনাচার হয়ে পড়ে। ইউরোপী বলে যে, শরীর সম্বন্ধী সমস্ত কার্য্য অতি গোপনে করা উচিত। উত্তম কথা। এই শৌচাদি ত দূরের কথা; লোকমধ্যে থুথু ফেলা একটা মহা অভদ্রতা! খেয়ে আচান সকলের সাম্‌নে, অতি লজ্জার কথা, কেন না কুলকুচো করা তায় আছে। লোকলজ্জার ভয়ে, খেয়ে দেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে;—ক্রমে দাঁতের সর্ব্বনাশ হয়। সভ্যতার ভয়ে অনাচার। আমাদের আবার দুনিয়ার লোকের সাম্‌নে, রাস্তায় বসে, বমির নকল কর্ত্তে কর্ত্তে মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, আচান,—এটা অত্যাচার। ওসমস্ত কার্য্য গোপনে করা উচিত নিশ্চিত, তবে না করাও অনুচিত।

আবার দেশভেদে যে সকল কার্য্য অনিবার্য্য, সেগুলো সমাজ সয়ে নেয়! আমাদের গরমদেশে খেতে বসে আধ ঘড়াই জল খেয়ে ফেলি—এখন ঢেঁকুর না তুলে যাই কোথা; কিন্তু ঢেঁকুর তোলা পাশ্চাত্যদেশে অতি অভদ্রের কাজ।

কিন্তু খেতে খেতে রুমাল বার করে দিব্যি নাক ঝাড়—তত দোষের নয়; আমাদের দেশে ঘৃণার কথা। এ ঠাণ্ডা দেশে মধ্যে মধ্যে নাক না ঝেড়ে থাকা যায় না।

ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়। ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচ্‌তে দিই। না ছুঁলেই হল! এদিকে যে নরককুণ্ডে বাস হচ্ছে, তার কি? একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার। একটা পাপ এড়াতে গিয়ে, আর একটা গুরুতর পাপ করছি। যার বাড়ীতে ময়লা, সে পাপী, তাতে আর সন্দেহ কি? তার সাজাও তাকে মরে পেতে হবে না,—অপেক্ষাও বড় বেশী কর্ত্তে হবে না।

আমাদের রান্নার মত পরিষ্কার রান্না কোথাও নেই। বিলেতি খাওয়ার শৃঙ্খলার মত পরিষ্কার পদ্ধতি আমাদের নেই। আমাদের রাঁধুনী স্নান করেছে, কাপড় বদ্‌লেছে; হাঁড়িপত্র উনুন সব ধুয়ে মেজে সাফ করেছে; নাকে মুখে গায়ে হাত ঠেক্‌লে, তখনি হাত ধুয়ে তবে আবার খাদ্যদ্রব্যে হাত দিচ্ছে। বিলাতি রাঁধুনীর চৌদ্দ পুরুষে কেউ স্নান করে নি; রাঁধতে রাঁধতে চাখছে, আবার সেই চাম্‌চে হাঁড়িতে ডোবাচ্ছে।

রুমাল বার করে ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লে, আবার

সেই হাতে ময়দা মাখলে। শৌচ থেকে এল—কাগজ ব্যবহার করে, সে হাত ধোবার নামটিও নেই—সেই হাতে রাঁধতে লাগলো। কিন্তু ধপ্‌ধপে কাপড় আর টুপী পরেছে। হয়তো, একটা মস্ত কাঠের টবের মধ্যে দুটো মানুষ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রাশীকৃত ময়দার উপর নাচছে—কিনা ময়দা মাখা হচ্ছে। গরমী কাল—দরবিগলিত ঘাম পা বেয়ে সেই ময়দায় সেঁদুচ্ছে। তার পর তার রুটি তৈয়ার যখন হল, তখন দুগ্ধফেননিভ তোয়ালের উপর চীনের বাসনে সজ্জিত হয়ে পরিষ্কার চাদর বিছানো টেবিলের উপর, পরিষ্কার কাপড় পরা কনুই পর্য্যন্ত সাদা দস্তানা পরা চাকর, এনে সামনে ধরলে! কোনও জিনিস হাত দিয়ে পাছে ছুঁতে হয়, তাই কনুই পর্য্যন্ত দস্তানা।

আহার সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আচারের তুলনা

আমাদের স্নান করা বামুন, পরিষ্কার বাসনে পরিষ্কার হাঁড়িতে, শুদ্ধ হয়ে রেঁধে গোময়সিক্ত মাটির উপর থালশুদ্ধ অন্ন ব্যঞ্জন ঝাড়লে; বামুনের কাপড়ে খাম্‌ছে ময়লা উঠছে। হয়ত মাটি ময়লা গোবর আর ঝোল, কলাপাতা ছেঁড়ার দরুণ, একাকার হয়ে, এক অপূর্ব্ব আস্বাদ উপস্থিত করলে !!

আমরা দিব্যি স্নান করে একখানা তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম, আর ইউরোপে, ময়লা গায়ে, না নেয়ে একটি ধপ্‌ধপে পোষাক পরলে। এইটি বেশ করে বোঝ,

এইটি আগা গোড়ার তফাৎ—হিঁদুর সেই যে অন্তর্দৃষ্টি তা আগা পাস্তলা সমস্ত কাজে। হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতি, সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে! হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যা তা হক! বিলাতির কাপড় সাফ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরককুণ্ড থাকুক না কেন! বিলাতির মেজে কারপেটে মোড়া ঝক্‌ঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হল!! হিঁদুর পয়োনালী রাস্তার উপর—দুর্গন্ধে বড় এসে যায় না। বিলাতির পয়োনালী রাস্তার নীচে—টাইফয়েড ফিভারের বাসা!! হিঁদু কচ্ছেন ভেতর সাফ। বিলাতি কচ্ছেন বাইরে সাফ।

চাই কি?—পরিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখধোয়া দাঁতমাজা, সব চাই—কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই। রাস্তাঘাটও পরিষ্কার চাই। পরিষ্কার রাঁধুনী, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই। আবার পরিষ্কার মনোরম স্থানে পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই। 'আচারঃ প্রথমো ধর্ম্মঃ'—(মনু ১-১০৮); আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া—সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচার ভ্রষ্টের কখন ধর্ম্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখছ না, দেখেও শিখছ না? এত ওলাউঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া, কার দোষ? আমাদের দোষ। আমরা মহা অনাচারী!!!

আহার শুদ্ধ হলে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হলে আত্ম-সম্বন্ধী অচলা স্মৃতি হয়—এ শাস্ত্রবাক্য আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েই মেনেছেন। তবে শঙ্করাচার্য্যের মতে আহার শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, আর রামানুজাচার্য্যের মতে ভোজ্যদ্রব্য। সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দুই অর্থই ঠিক। বিশুদ্ধ আহার না হলে ইন্দ্রিয়সকল যথাযথ কার্য্য কি করেই বা করে? কদর্য্য আহারে ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহণ-শক্তির হ্রাস হয় বা বিপর্য্যয় হয়, এ কথা সকলেরই প্রত্যক্ষ। অজীর্ণ দোষে এক জিনিসকে আর এক বলে ভ্রম হওয়া এবং আহারের অভাবে দৃষ্টি আদি শক্তির হ্রাস সকলেই জানেন। সেই প্রকার কোন বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা উপস্থিত করে, তাও ভূয়ো-দর্শনসিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে এত খাদ্যাখাদ্যের বাচ-বিচার, তার মূলেও এই তত্ত্ব; যদিও অনেক বিষয়ে আমরা বস্তু ভুলে, আধারটা নিয়েই টানা হেঁচড়া করছি এখন।

রামানুজাচার্য্য ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলছেন। জাতিদোষ অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতি-গত; যেমন প্যাঁজ লসুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। আশ্রয়দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হতে আসে; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলেই দুষ্টবুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে

সদ্‌বুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্তদোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য্য কীট-কেশাদি-দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতিদোষ এবং নিমিত্তদোষ থেকে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই কর্ত্তে পারে, আশ্রয়দোষ হতে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয়দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুঁৎমার্গ 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা'। তবে অনেক স্থলেই 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হয়ে যায় এবং মানে না বুঝে একটা কিম্ভূত-কিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। এস্থলে লোকাচার ছেড়ে লোকগুরু মহাপুরুষদের আচারই গ্রহণীয়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি জগদ্‌গুরুদের জীবনী পড়ে দেখ, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি ব্যবহার করে গেছেন। জাতিদুষ্ট অন্ন ভোজন সম্বন্ধে, ভারতবর্ষের মত শিক্ষার স্থল এখনও পৃথিবীতে কোথাও নেই। সমস্ত ভূমণ্ডলে, আমাদের দেশের মত পবিত্র দ্রব্য আহার করে, এমন আর কোন দেশ নেই। নিমিত্তদোষ সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে বড়ই ভয়ানক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে; ময়রার দোকান, বাজারে খাওয়া, এ সব মহা অপবিত্র দেখতেই পাচ্ছ, কিরূপ নিমিত্তদোষে দুষ্ট ময়লা আবর্জ্জনা পচা পক্কড় সব ওতে আছেন,—এর ফল হচ্ছে তাই। এই যে ঘরে ঘরে অজীর্ণ ও ঐ ময়রার দোকান, বাজারে খাওয়ার ফল। এই যে প্রস্রাবের ব্যায়রামের প্রকোপ, ওও ঐ ময়রার দোকান। ঐ যে পাড়াগাঁয়ে লোকের তত

অজীর্ণদোষ, প্রস্রাবের ব্যায়রাম হয় না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে লুচি কচুরি প্রভৃতি 'বিষলড্ডুকের' অভাব। এ কথা বিস্তার করে পরে বলছি।

এই ত গেল খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে প্রাচীন সাধারণ নিয়ম। এ নিয়মের মধ্যে আবার অনেক মতামত প্রাচীন-কালে চলেছে এবং আধুনিক কালে চলছে। প্রথম প্রাচীন কাল হতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এক মহা বিবাদ, আমিষ আর নিরামিষ। মাংস-ভোজন উপকারক কি অপকারক? তা ছাড়া জীবহত্যা ন্যায় বা অন্যায়, এ এক মহা বিতণ্ডা চিরদিনের। একপক্ষ বলছেন—কোনও কারণে হত্যারূপ পাপ করা উচিত নয়; আর একপক্ষ বলছেন—রাখ তোমার কথা, হত্যা না করলে প্রাণধারণই হয় না। শাস্ত্রবাদীদের ভেতর মহাগোল। শাস্ত্রে একবার বলছেন, যজ্ঞস্থলে হত্যা কর—আবার বলছেন, জীবঘাত করো না। হিঁদুরা সিদ্ধান্ত করছেন যে যজ্ঞ ছাড়া অন্যত্র হত্যা করা পাপ। কিন্তু যজ্ঞ করে সুখে মাংস ভোজন কর। এমন কি, গৃহস্থের পক্ষে অনেকগুলি নিয়ম আছে যে, সে সে স্থলে হত্যা না করলে পাপ;—যেমন শ্রাদ্ধাদি। সে সকল স্থলে নিমন্ত্রিত হয়ে মাংস না খেলে পশুজন্ম হয়—মনু বলছেন। অপর দিকে জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলছেন যে, তোমার শাস্ত্র

আমিষ ও নিরামিষ ভোজন

মানি নি, হত্যা করা কিছুতেই হবে না। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক, যে যজ্ঞ করবে বা নিমন্ত্রণ করে মাংস খাওয়াবে, তাকে সাজা দিচ্ছেন। আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁপরে—তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন—রামায়ণ মহাভারতে রয়েছে। সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত, আর হাজার কলসী মদ মানছেন।[১] বর্ত্তমান কালে শাস্ত্রও শুনবে না, মহাপুরুষ বলেছেন বল্লেও শোনে না। পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় ইত্যাদি। একপক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর যত রোগ; অপরপক্ষ বলছেন,

---

১ সীতামাদায় বাহুভ্যাং মধুমৈরেয়কং শুচি।
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিন্দ্রো যথামৃতম্॥
মাংসানি চ সুমিষ্টানি বিবিধানি ফলানি চ।
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্॥

—রামায়ণ, উত্তর ৫২

সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবী পুরীং পুনরুপাগতা॥

—রামায়ণ, অযোধ্যা ৫৫

উভৌ মধ্বাসবক্ষিপ্তৌ উভৌ চন্দনচর্চ্চিতৌ।
উভৌ পর্য্যঙ্করথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জ্জুনৌ॥

—মহাভারত, আদিপর্ব্ব

৪

ও গল্প কথা, তা হলে হিঁদুরা নীরোগ হত, আর ইংরেজ আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী জাত, রোগে লোপাট হয়ে যেত এতদিনে। একপক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বলছেন যে, কপি খেলে কোপো বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড়বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। একপক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা আছে মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বলছেন, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। একপক্ষ বলছেন যে, নিরামিষ খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম কর্ত্তে পারে; অপর পক্ষ বলছেন, তা হলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হতো; চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান ও প্রধান। মাংসাহারী বলছে, হিঁদু চীনে দেখ, খেতে পায় না, ভাত খেয়ে শাক পাতড়া খেয়ে মরে, ওদের দুর্দ্দশা দেখ—আর জাপানীরাও ঐ ছিল; মাংসাহার আরম্ভ করে অবধি ওদের ভোল ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে দেড়লাখ হিন্দুস্থানী সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় দেখ। উত্তম সেপাই গোর্‌খা বা শিখ কে কবে নিরামিষাশী দেখ। একপক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারে বদহজম, আর একপক্ষ বলছেন—সব ভুল, নিরামিষাশীগুলোরই যত পেটের রোগ। একপক্ষ

বলছেন, তোমার কোষ্ঠশুদ্ধিরোগ শাক পাত্ড়া খেয়ে জোলাপবৎ ভাল হয়ে যায়, তা বলে কি দুনিয়াশুদ্ধকে তাই করতে চাও ? ফলকথা, চিরকালই মাংসাশী জাতিরাই যুদ্ধবীর চিন্তাশীল ইত্যাদি। মাংসাশী জাতেরা বলছেন যে, যখন যজ্ঞের ধূম দেশময় উঠত, তখনই হিঁদুর মধ্যে ভাল ভাল মাথা বেরিয়েছে, এ বাবাজীডৌল হয়ে পর্য্যন্ত একটাও মানুষ জন্মাল না। এ বিধায় মাংসাশীরা ভয়ে মাংসাহার ছাড়তে চায় না। আমাদের দেশে আর্য্যসমাজী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাদ উপস্থিত। একপক্ষ বলছেন যে, মাংস খাওয়া একান্ত আবশ্যক; আর পক্ষ বলছেন, একান্ত অন্যায়। এই ত বাদ বিবাদ চলছে। সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার ত বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্ম-কর্ম্ম-ভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ-ভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্ম্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটে খুটে এই সংসারের দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈ কি। যতদিন মনুষ্য-সমাজে এই ভাব থাকবে, 'বলবানের জয়,' ততদিন মাংস খেতে হবে বা অন্য কোনও রকম মাংসের ন্যায় উপযোগী আহার আবিষ্কার কর্ত্তে হবে। নইলে বলবানের পদতলে

তুর্ব্বল পেষা যাবেন! রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বল্লে চলে না—জাতি জাতির তুলনা করে দেখ।

আবার নিরামিষাশীদের মধ্যেও হচ্ছে কোঁদল। একপক্ষ বলছেন যে ভাত, আলু, গম, যব, জনার প্রভৃতি শর্করাপ্রধান খাদ্যও কিছুই নয়, ও সব মানুষে বানিয়েছে, ঐ সব খেয়েই যত রোগ। শর্করা-উৎপাদক (starchy) খাবার রোগের ঘর। ঘোড়া গরুকে পর্য্যন্ত ঘরে বসে চাল গম খাওয়ালে রোগী হয়ে যায়, আবার মাঠে ছেড়ে দিলে কচি ঘাস খেয়ে তাদের রোগ সেরে যায়। ঘাস শাক পাতা প্রভৃতি হরিৎ সবজিতে শর্করা-উৎপাদক পদার্থ বড্ড কম। বনমানুষ জাতি বাদাম ও ঘাস খায়, আলু গম ইত্যাদি খায় না; যদি খায় ত অপক্ক অবস্থায় যখন ষ্টার্চ্চ (starch) অধিক হয় নি। এই সমস্ত নানাপ্রকার বিতণ্ডা চলছে। একপক্ষ বলছেন, শূল্য মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং তুগ্ধ এইমাত্র ভোজনই দীর্ঘ জীবনের উপযোগী। বিশেষ ফল, ফলাহারী অনেক দিন পর্য্যন্ত যুবা থাকবে, কারণ ফলের খাট্টা হাড়-গোড়ে জঙ্গ ধরতে দেয় না।

এখন সর্ব্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয় এমন খাওয়া খাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন

লাগে তাকে হজম করতে ;—যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকি আর কি কাজ করবার শক্তি রইল ?

ভাজা জিনিসগুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ী। ঘি তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ। ঘিয়ের চেয়ে মাখন শীঘ্র হজম হয়। ময়দায় কিছুই নাই, দেখতেই সাদা। গমের সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই সুখাদ্য।

আমাদের দেশের খাদ্যের সমালোচনা

আমাদের বাঙ্গালা দেশের জন্য এখনও দূর্ পল্লীগ্রামে যে সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাহাই প্রশস্ত। কোন্ প্রাচীন বাঙ্গালী কবি লুচি কচুরির বর্ণনা কচ্ছেন ? ও লুচি কচুরি এসেছে পশ্চিম থেকে। সেখানেও কালেভদ্রে লোকে খায়। উপরি উপরি 'পাকি রসুই', খেয়ে থাকে এমন লোক ত দেখি নি! মথুরার চোবে কুস্তিগীর লুচি-লড্ডুকপ্রিয় ; দুচার বৎসরেই চোবের হজমের সর্ব্বনাশ হয়, আর চোবেজী চূরণ খেয়ে খেয়ে মরেন।

গরীবরা খাবার জোটে না বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে। যা তা পেটে পোরার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার দোকানের খাবারের খাদ্যদ্রব্যে কিছুই নেই, একদম উল্‌টো আছেন বিষ—বিষ—বিষ। পূর্ব্বে লোকে কালেভদ্রে ঐ পাপগুলো খেত ; এখন শহরের লোক বিশেষ বিদেশী যারা শহরে বাস করে, তাদের

নিত্য ভোজন হচ্ছে ঐ। এতে অজীর্ণরোগে অপমৃত্যু হবে তায় কি বিচিত্র! ক্ষিদে পেলেও কচুরি জিলিপি খানায় ফেলে দিয়ে, এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে। ভাত, ডাল, আটার রুটি, মাছ, শাক, দুধ যথেষ্ট খাদ্য। তবে ডাল দক্ষিণীদের মত খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোলমাত্র, বাকিটা গরুকে দিও। মাংস খাবার পয়সা থাকে, খাও, তবে ও পশ্চিমি নানাপ্রকার গরম মশলাগুলো বাদ দিয়ে। মশলাগুলো খাওয়া নয়— ওগুলো অভ্যাসের দোষ। ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য। কচি কলাইসুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদ; পারিস রাজধানীর ঐ সূপ একটি বিখ্যাত খাওয়া। কচি কলাইসুঁটি খুব সিদ্ধ করে, তারপর তাকে পিষে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তারপর একটা দুধছাঁকনীর মত তারের ছাঁকনিতে ছাঁকলেই খোসাগুলো বেরিয়ে আস্‌বে। এখন হলুদ ধনে জিরেমরিচ লঙ্কা, যা দেবার দিয়ে সাতলে নাও—উত্তম সুস্বাদ সুপাচ্য ডাল হল। যদি একটা পাঁঠার মুড়ি বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে, ত উপাদেয় হয়।

ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধূম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ, দু চার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাকি সব বদ্‌হজম। পেটে পুরলেই কি খাওয়া হলো? যেটুকু হজম হবে, সেই-টুকুই খাওয়া। ভুঁড়ি নাবা বদ্ হজমের প্রথম চিহ্ন। শুকিয়ে

যাওয়া বা মোটা হওয়া দুটোই বদ্‌হজম। পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আল্‌বুমেন (Albumen) দেখা দিয়েছে বলেই 'হাঁ' করে বসো না। ওসব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, অজীর্ণ না হতে পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁট আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পার ছুটি নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থযাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ 'ভাল কর্ত্তে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি তা বল্।' পারতপক্ষে ওষুধ খেয়ো না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওযুধে মরে পনের আনা! পার যদি প্রতি বৎসর পূজার বন্ধের সময় হেঁটে দেশে যাও। ধন হওয়া, আর কুড়ের বাদশা হওয়া—দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধরে হাঁটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা ত জীবন্ত রোগী, সেটা ত হতভাগা। যেটা লুচির ফুল্‌কো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা ত মরে আছে। যে এক দমে দশ-ক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো? সেধে রোগ, অকালমৃত্যু ডেকে আন্‌লে কে কি কর্‌বে?

আবার ঐ যে পাঁউরুটি, উনিও হচ্ছেন বিষ, ওঁকে ছুঁয়ো না একদম। খাম্বীর মিশলেই ময়দা এক থেকে আর হয়ে দাঁড়ান। কোনও খাম্বীরদার জিনিস খাবে না, এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে সর্ব্বপ্রকার খাম্বীরদার জিনিসের নিষেধ আছে, এ বড় সত্য। শাস্ত্রে যে কোনও জিনিস মিষ্টি থেকে টকেছে, তার নাম শুক্ত ; তা খেতে নিষেধ,—কেবল দই ছাড়া। দই অতি উপাদেয়—উত্তম জিনিস। যদি একান্ত পাঁউরুটি খেতে হয়, ত তাকে পুনর্ব্বার খুব আগুনে সেঁকে খেও। অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ। আমেরিকায় এখন জল-শুদ্ধির বড়ই ধূম। এখন ঐ যে ফিল্‌টার, ওর দিন গেছে চুকে। অর্থাৎ ফিল্‌টার জলকে ছেঁকে দেয় মাত্র, কিন্তু রোগের বীজ যে সকল কীটাণু তাতে থাকে, ওলাউঠা প্লেগের বীজ, তা যেমন তেমনি থাকে ; অধিকন্তু ফিল্‌টারটি স্বয়ং ঐ সকল বীজের জন্মভূমি হয়ে দাঁড়ান। কলকেতায় যখন প্রথম ফিল্‌টার করা জল হল, তখন পাঁচ বৎসর নাকি ওলাউঠা হয় নাই ; তারপর যে কে সেই, অর্থাৎ সে ফিল্‌টার মশাই এখন স্বয়ং ওলাউঠা বীজের আবাস হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ফিল্‌টারের মধ্যে দিশি তেকাঠার ওপর ঐ যে তিন কলসীর ফিল্‌টার উনিই উত্তম, তবে দু তিন দিন অন্তর বালি বা কয়লা বদলে দিতে হবে বা পুড়িয়ে নিতে হবে। আর

ঐ যে একটু ফট্‌কিরি দেওয়া গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের অভ্যাস, ঐটি সকলের চেয়ে ভাল। ফট্‌কিরির গুঁড়ো যথাসম্ভব মাটি ময়লা ও রোগের বীজ সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যান। গঙ্গাজল জালায় পুরে একটু ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিয়ে থিতিয়ে যে আমরা ব্যবহার করি, ও তোমার বিলিতি ফিল্‌টার মিলটারের চোদ্দপুরুষের মাথায় ঝাঁটা মারে, কলের জলের দুশো বাপন্ত করে। তবে জল ফুটিয়ে নিতে পারলে নির্ভয় হয় বটে। ফট্‌কিরি-থিতোন জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ব্যবহার কর, ফিল্‌টার মিলটার খানায় ফেলে দাও। এখন আমেরিকায় বড় বড় যন্ত্রযোগে জলকে একদম বাষ্প করে দেয়, আবার সেই বাষ্পকে জল করে, তারপর আর একটা যন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু তার মধ্যে পুরে দেয়, যে বায়ুটা বাষ্প হবার সময় বেরিয়ে যায়। সে জল অতি বিশুদ্ধ; ঘরে ঘরে এখন দেখছি তাই। যার দুপয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুরি মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত রুটি খাওয়া অপমান!! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না ত কি? এত বড় ষণ্ডা জাত ইংরেজ, এরা ভাজাভুজি মেঠাই মণ্ডার নামে ভয় খায়, যাদের বরফান্ দেশে বাস, দিনরাত কসরৎ! আর আমাদের অগ্নিকুণ্ডে বাস, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে নড়ে বসতে

চাইনি, আর আহার লুচি কচুরি মেঠাই—ঘিয়েভাজা, তেলেভাজা !! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিত, দুকুড়ি কই মাছ কাঁটাশুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ী চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে; 'কলকত্তা'ই হওয়ার এই ফল !! আর সর্ব্বনাশ করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার বদ্দিগুলো। ওরা সবজান্তা, ওষুধের জোরে ওরা সব কর্ত্তে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে, ত অমনি একটু ওষুধ দাও; পোড়া বদ্দিও বলে না যে, দূর কর ওষুধ, যা, দুক্রোশ হেঁটে আস্‌গে যা। নানান্ দেশ দেখছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত ডাল ঝোল চচ্চড়ি, শুক্তো মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জ্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাকতে তোমরা যে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝছো না, এই আপ্‌-সোস। খাবার নকল কি ইংরেজের কর্ত্তে হবে—সে টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙ্গালী খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব্ব-বাঙ্গলায়, ওদের নকল কর, যত পার। যত পশ্চিমের দিকে ঝুক্‌বে, ততই খারাপ; শেষ কলাইয়ের ডাল আর মাছের টক্ মাত্র—আধাসাঁওতালী বীরভূম বাঁকুড়োয় দাঁড়াবে!! তোমরা

কলকেতার লোক, ঐ যে এক সর্ব্বনেশে ময়দার তালে হাতে মাটি দেওয়া ময়রার দোকানরূপ সর্ব্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছে, ওর মোহিনীতে বীরভূম, বাঁকড়ো, ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাকা বিক্রমপুরও ঢাঁইমাছ, কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে, 'সইভ্য' হচ্ছে !! নিজেরা ত উচ্ছন্ন গেছ, আবার দেশশুদ্ধকে দিচ্ছ, এই তোমরা বড্ড সভ্য, শহুরে লোক ! তোমাদের মুখে ছাই ! ওরাও এমনি আহাম্মক যে, ঐ কলকেতার আবর্জ্জনাগুলো খেয়ে উদরাময় হয়ে মর মর হবে তবু বলবে না, যে এগুলো হজম হচ্ছে না, বলবে—নোনা লেগেছে !! কোনও রকম করে শহুরে হবে !!

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে ত এই মোট কথা শুনলে। এখন পাশ্চাত্যরা কি খায় এবং তাদের আহারের ক্রমশঃ কেমন পরিবর্ত্তন হয়েছে, তাও কিছু বলি।

পাশ্চাত্যদের আহার

গরীব অবস্থায় সকল দেশের খাওয়াই ধান্য বিশেষ ; এবং শাক তরকারী, মাছ মাংস বিলাসের মধ্যে এবং চাট্নির মত ব্যবহৃত হয়। যে দেশে যে শস্য প্রধান ফসল, গরীবদের প্রধান খাওয়া তাই ; অন্যান্য জিনিস আনুষঙ্গিক। যেমন বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা, মাদ্রাজ উপকূলে ও মালাবার

উপকূলে ভাত প্রধান খাদ্য; তার সঙ্গে ডাল, তরকারি, কখন কখন মাছ মাংস চাটনিবৎ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য সর্ব্বদেশে অবস্থাপন্ন লোকের জন্য গমের রুটি ও ভাত; সাধারণ লোকের নানাপ্রকার বজ্‌রা, মড়ুয়া, জনার, ঝিঙ্গোরা, প্রভৃতি ধান্যের রুটি প্রধান খাদ্য।

শাক, তরকারি, ডাল, মাছ, মাংস, সমস্তই সমগ্র ভারতবর্ষে ঐ রুটি বা ভাতকে সুস্বাদ করবার জন্য ব্যবহার—তাই ওদের নাম ব্যঞ্জন। এমন কি পঞ্জাব, রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্য দেশে অবস্থাপন্ন আমিষাশী লোকেরা, এমন কি রাজারাও, যদিও নিত্য নানাপ্রকার মাংস ভোজন করেন, তথাপি রুটি বা ভাতই প্রধান খাদ্য। যে ব্যক্তি আধসের মাংস নিত্য খায়, সে এক সের রুটি তার সঙ্গে নিশ্চিত খায়।

পাশ্চাত্যদেশে এখন যে সকল গরীব দেশ আছে এবং ধনীদেশের গরীবদের মধ্যে ঐ প্রকার রুটি এবং আলুই প্রধান খাদ্য; মাংসের চাট্‌নি মাত্র—তাও কালে ভদ্রে। স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ইতালি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণদেশে যথেষ্ট দ্রাক্ষা জন্মায় এবং দ্রাক্ষা-ওয়াইন্ অতি সস্তা। সে সকল ওয়াইনে মাদকতা নাই (অর্থাৎ পিপেখানেক না খেলে ত আর নেশা হবে না এবং তা কেউ খেতেও পারে না) এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। সে দেশের দরিদ্র লোকে এজন্য মাছ মাংসের জায়গায় ঐ দ্রাক্ষা-রস

দ্বারা পুষ্টি সংগ্রহ করে। কিন্তু উত্তরাঞ্চল, যেমন রুশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে দরিদ্র লোকের আহার প্রধানতঃ রাই-নামক ধান্যের রুটি ও এক আধ টুক্‌রা শুঁট্‌কি মাছ ও আলু।

ইউরোপের অবস্থাপন্ন লোকের এবং আমেরিকার আবালবৃদ্ধবনিতার খাওয়া আর এক রকম, অর্থাৎ রুটি, ভাত প্রভৃতি চাট্‌নি এবং মাছ মাংসই হচ্ছে খাওয়া। আমেরিকায় রুটি খাওয়া নাই বল্লেই হয়। মাছ মাছই এলো, মাংস মাংসই এলো, তাকে অমনি খেতে হবে, ভাত রুটির সংযোগে নয়। এবং এজন্য প্রত্যেক বারেই থালা বদ্‌লান হয়। যদি দশটা খাবার জিনিস থাকে ত দশবার থালা বদ্‌লাতে হয়। যেমন মনে কর, আমাদের দেশে প্রথমে শুধু শুক্ত এলো, তারপর থালা বদ্‌লে শুধু ডাল এলো, আবার থালা বদ্‌লে শুধু ঝোল এলো, আবার থালা বদ্‌লে দুটি ভাত, নয় ত দুখান লুচি ইত্যাদি। এর লাভের মধ্যে এই যে, নানা জিনিস অল্প অল্প খাওয়া হয়, পেট বোঝাই করা হয় না। ফরাসী চাল, সকালবেলা 'কাফি' এবং এক আধ টুকরো রুটি মাখম; দুপুরবেলা মাছ মাংস ইত্যাদি মধ্যবিৎ; রাত্রে লম্বা খাওয়া। ইতালি, স্পেন প্রভৃতি জাতিদের ঐ এক রকম; জর্ম্মানরা ক্রমাগত খাচ্ছে—পাঁচ বার, ছ বার, প্রত্যেক বারেই অল্প বিস্তর

মাংস। ইংরেজরা তিনবার; সকালে অল্প, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কাফি-যোগ, চা-যোগ আছে। আমেরিকানদের তিন-বার—উত্তম ভোজন, মাংস প্রচুর। তবে এ সকল দেশেই 'ডিনার'টা প্রধান খাদ্য—ধনী হলে, তার ফরাসী রাঁধুনী এবং ফরাসী চাল। প্রথমে একটু আধটু নোনা মাছ বা মাছের ডিম, বা কোনও চাট্‌নী বা সব্‌জী। এটা হচ্ছে ক্ষুধাবৃদ্ধি, তারপর সূপ; তারপর আজকাল ফ্যাসান—একটা ফল; তারপর মাছ, তারপর মাংসের একটা তরকারি, তারপর থান-মাংস শূল্য, সঙ্গে কাঁচা সব্‌জি; তারপর আরণ্য মাংস মৃগপক্ষ্যাদি; তারপর মিষ্টান্ন, শেষ কুল্পী—'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। ধনী হলে প্রায় প্রত্যেক বার থাল বদ্‌লাবার সঙ্গে সঙ্গে মদ্‌ বদ্‌লাচ্ছে—সেরি, ক্ল্যারেট, স্যামপাঁ ইত্যাদি এবং মধ্যে মধ্যে মদের কুল্পী একটু আধটু। থাল বদ্‌লাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা চামচ সব বদ্‌লাচ্ছে—আহারান্তে 'কাফি'—বিনা দুগ্ধ, আসবমদ্য খুদে খুদে গ্লাসে এবং ধূমপান। খাওয়ার রকমারির সঙ্গে মদের রকমারি দেখাতে পারলে তবে 'বড়মানুষি চাল' বলবে। একটা খাওয়ায় আমাদের দেশের একটা মধ্যবিৎ লোক সর্ব্বস্বান্ত হতে পারে, এমন খাওয়ার ধূম এরা করে।

আর্য্যরা একটা পীঠে বসত, একটা পীঠে ঠেসান্

দিত এবং জলচৌকির উপর থালা রেখে, এক থালাতেই সকল খাওয়া খেত। ঐ চাল এখনও পঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর দেশে বিদ্যমান। বাঙ্গালী, উড়ে, তেলিঙ্গি, মালাবারি প্রভৃতি মাটিতেই "সাপ্‌ড়ান"। মহীশূরের মহারাজও মাটিতে আঙ্গট্‌ পাতে ভাত ডাল খান। মুসলমানেরা চাদর পেতে খায়। বর্ম্মি, জাপানী প্রভৃতি উপু হয়ে বসে মাটিতে থাল রেখে খায়। চীনেরা টেবিলে খায়; চেয়ারে বসে, কাটি ও চামচ-যোগে খায়। রোমান ও গ্রীক্‌রা কোচে শুয়ে টেবিলের ওপর থেকে হাত দিয়ে খেত। ইউরোপীরা টেবিলের ওপর হতে, কেদারায় বসে, হাত দিয়ে পূর্ব্বে খেত; এখন নানাপ্রকার কাঁটা চামচ।

চীনের খাওয়াটা কসরৎ বটে—যেমন আমাদের পানওয়ালীরা দুখানা সম্পূর্ণ আলাদা লোহার পাতকে হাতের কায়দায় কাঁচির কাজ করায়, চীনেরা তেমনি দুটো কাটিকে ডান হাতের দুটো আঙ্গুল আর মুঠোর কায়দায় চিম্‌টের মত করে শাকাদি মুখে তোলে। আবার দুটোকে একত্র করে, একবাটি ভাত মুখের কাছে এনে, ঐ কাটিদ্বয়নির্ম্মিত খোন্তাযোগে ঠেলে ঠেলে মুখে পোরে।

সকল জাতিরই আদিম পুরুষ নাকি প্রথম অবস্থায় যা পেত তাই খেত। একটা জানোয়ার মারলে, সেটাকে এক

মাস ধরে খেত ; পচে উঠলেও তাকে ছাড়্‌ত না। ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো, চাষ বাস শিখলে ; আরণ্য পশুকুলের মত একদিন বেদম্ খাওয়া, আর দু পাঁচ দিন অনশন ঘুচ্‌লো ; আহার নিত্য জুটতে লাগল ; কিন্তু পচা জিনিস খাবার চাল একটা দাঁড়িয়ে গেল। পচা দুর্গন্ধ একটা যা হয় কিছু, আবশ্যক ভোজ্য হতে নৈমিত্তিক আদরের চাট্‌নি হয়ে দাঁড়াল।

এস্কুইমো জাতি বরফের মধ্যে বাস করে। শস্য সে দেশে একদম জন্মায় না ; নিত্য ভোজন—মাছ মাংস ; ১০।৫ দিনে অরুচি বোধ হলে, একটুকরা পচা মাংস খায়—অরুচি সারে।

ইউরোপীরা এখনও, বন্য পশু পক্ষীর মাংস না পচলে খায় না। তাজা পেলেও তাকে টাঙ্গিয়ে রাখে—যতক্ষণ না পচে দুর্গন্ধি হয়। কলকেতায় পচা হরিণের মাংস পড়তে পায় না ; রসা ভেটকির উপাদেয়তা প্রসিদ্ধ। ইংরেজদের পনীর যত পচবে, যত পোকা কিলবিল করবে, ততই উপাদেয়। পলায়মান পনীর-কীটকেও তাড়া করে ধরে মুখে পুরবে—তা নাকি বড়ই সুস্বাদ !! নিরামিষাশী হয়েও প্যাঁজ লসুনের জন্য ছোঁক ছোঁক করবে, দক্ষিণী বামুনের প্যাঁজ লসুন নইলে খাওয়াই হবে না। শাস্ত্রকারেরা সে পথও বন্ধ করে দিলেন। প্যাঁজ, লসুন, গেঁয়ো

শোর, গেঁয়ো মুরগী খাওয়া, এক জাতের পাপ, সাজা— জাতিনাশ। যারা শুনলে এ কথা তারা ভয়ে প্যাঁজ লসুন ছাড়লে, কিন্তু তার চেয়ে বিষমতুর্গন্ধ হিঙ্গ খেতে আরম্ভ করলে! পাহাড়ী গোঁড়া হিঁছু লসুনে-ঘাস প্যাঁজ লসুনের জায়গায় ধরলে। ও তুটোর নিষেধ ত আর পুঁথিতে নেই !!

আহারসম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধের তাৎপর্য্য

সকল ধর্ম্মেই খাওয়া-দাওয়ার একটা বিধি-নিষেধ আছে; নাই কেবল ক্রিশ্চানি ধর্ম্মে। জৈন, বৌদ্ধয় মাছ মাংস খাবেই না। জৈন আবার যা মাটির নীচে জন্মায়, আলু, মূলো প্রভৃতি, তাও খাবে না। খুঁড়তে গেলে পোকা মরবে, রাত্রে খাবে না—অন্ধকারে পাছে পোকা খায়।

য়াহুদীরা যে মাছে আঁশ নেই তা খাবে না, শোর খাবে না, যে জানোয়ার দ্বিশফ নয় এবং জাবর কাটে না, তাকেও খাবে না। আবার বিষম কথা, তুধ বা তুগ্ধোৎপন্ন কোন জিনিস যদি হেঁসেলে ঢোকে, যখন মাছ মাংস রান্না হচ্ছে, ত সে সব ফেলে দিতে হবে। এ বিধায় গোঁড়া য়াহুদী অন্য কোনও জাতির রান্না খায় না। আবার হিঁতুর মত য়াহুদীরা বৃথা-মাংস খায় না। যেমন বাংলা দেশে ও পঞ্জাবে মাংসের নাম 'মহাপ্রসাদ'। য়াহুদীরা সেই প্রকার মহাপ্রসাদ অর্থাৎ যথানিয়মে বলিদান না হলে, মাংস খায় না। কাজেই

৫

হিঁদুর মত য়াহুদীদেরও যে সে দোকান হতে মাংস কেনবার অধিকার নেই। মুসলমানরা য়াহুদীদের অনেক নিয়ম মানে, তবে অত বাড়াবাড়ি করে না; দুধ, মাছ, মাংস, একসঙ্গে খায় না এইমাত্র, ছোঁয়া ছুঁয়ি হলেই যে সর্ব্বনাশ, অত মানে না। য়াহুদীদের আর হিঁদুদের অনেক সৌসাদৃশ্য —খাওয়া সম্বন্ধে; তবে য়াহুদীরা বুনো শোরও খায় না, হিঁদুরা খায়। পঞ্জাবে মুসলমান হিঁদুর বিষম সংঘাত থাকায়, বুনো শোর আবার হিঁদুদের একটা অত্যাবশ্যক খাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজপুতদের মধ্যে বুনো শোর শিকার করে খাওয়া, একটা ধর্ম্মবিশেষ। দক্ষিণ দেশে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতের মধ্যে গেঁয়ো শোরও যথেষ্ট চলে। হিঁদুরা বুনো মুরগী খায়, গেঁয়ো খায় না। বাঙ্গলা দেশ থেকে নেপাল ও আকাশ্মীর হিমালয়—এক রকম চালে চলে। মনূক্ত খাওয়ার প্রথা এই অঞ্চলেই সমধিক বিদ্যমান আজও।

কিন্তু কুমায়ুন হতে আরম্ভ করে কাশ্মীর পর্য্যন্ত, বাঙ্গালী, বেহারী, প্রয়াগী ও নেপালীর চেয়েও মনুর আইন বিশেষ প্রচার। যেমন বাঙ্গালী মুরগী বা মুরগীর ডিম খায় না, কিন্তু হাঁসের ডিম খায়, নেপালীও তাই; কিন্তু কুমায়ুন হতে তাও চলে না। কাশ্মীরীরা বুনো হাঁসের ডিম পেলে সুখে খায়, গ্রাম্য নয়।

আলাহাবাদের পর হতে, হিমালয় ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত দেশে যে ছাগল খায়, সে মুরগীও খায়।

এই সকল বিধি নিষেধের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বাস্থ্যের জন্য, তার সন্দেহ নাই। তবে সকল জায়গায় সমান পারে না। শোর মুরগী যা তা খায়, অতি অপরিষ্কার জানোয়ার, কাজেই নিষেধ; বুনো জানোয়ার কি খায় কে দেখতে যায় বল। তা ছাড়া রোগ—বুনো জানোয়ারে কম।

দুধ, পেটে অম্লাধিক্য হলে একেবারে দুষ্পাচ্য, এমন কি একদমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে কখন কখন সন্তঃ মৃত্যু ঘটেছে। দুধ—যেমন শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেমনি ঢোকে ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরী লাগে। দুধ একটা গুরুপাক জিনিস, মাংসের সঙ্গে হজম আরও গুরুপাক, কাজেই এ নিষেধ য়াহুদীদের মধ্যে। মূর্খ মাতা কচি ছেলেকে জোর করে ঢক্ ঢক্ করে দুধ খাওয়ায় আর দু ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে!! এখানকার ডাক্তারেরা পূর্ণবয়স্কের জন্যও এক-পোয়া দুধ আস্তে আস্তে আধ ঘণ্টায় খাওয়ার বিধি দেন; কচি ছেলেদের জন্য 'ফিডিং বটল' ছাড়া উপায়ান্তর নেই। মা ব্যস্ত কাজে—দাসী একটা ঝিনুকে করে ছেলেটাকে চেপে ধরে সাঁ সাঁ দুধ খাওয়াচ্ছে!! লাভের মধ্যে এই যে রোগা-পটকাগুলো আর বড়, বড় হচ্ছে না, তারা ঐখানেই

জন্মের শোধ দুধ খাচ্ছে ; আর যেগুলো এ বিষম খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে ঠেলে ঠুলে উঠছে সেগুলো প্রায় সুস্থকায় এবং বলিষ্ঠ।

সেকেলে আঁতুড় ঘর, দুধ খাওয়ান প্রভৃতির হাত থেকে যে ছেলেপিলেগুলো বেঁচে উঠত, সেগুলো একরকম সুস্থ সবল আজীবন থাকত। মা ষষ্ঠীর সাক্ষাৎ বরপুত্র না হলে কি আর সেকালে একটা ছেলে বাঁচত !! সে তাপসেঁক, দাগাফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা, প্রসূতি ও প্রসূত উভয়েরই পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। হরিল্লুঠের তুলসী তলার খোকা ও মা—দুই প্রায় বেঁচে যেত, সাক্ষাৎ যম-রাজের দূত চিকিৎসকের হাত এড়াত বলে।

কাপড়ে সভ্যতা

সকল দেশেই কাপড়ে চোপড়ে কিছু না কিছু ভদ্রতা লেগে থাকে। 'ব্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুঝবো ক্যামনে ?' শুধু ব্যাতনে নয়, 'কাপড় না দেখলে ভদ্র অভদ্র বুঝব ক্যামনে' সর্ব্বদেশে কিছু না কিছু চলন। আমাদের দেশে শুধু গায়ে ভদ্রলোক রাস্তায় বেড়ুতে পারে না, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আবার পাগড়ী না মাথায় দিয়ে কেউই রাস্তায় বেরোয় না। পাশ্চাত্য দেশে ফরাসীরা বরাবর সকল বিষয়ে অগ্রণী,—তাদের খাওয়া, তাদের পোষাক সকলে নকল করে। এখনও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ পোষাক বিদ্যমান,

কিন্তু ভদ্র হলেই, দুপয়সা হলেই, অমনি সে পোষাক অন্তর্দ্ধান হন, আর ফরাসী পোষাকের আবির্ভাব। কাবুলী পাজামা-পরা ওলন্দাজি চাষা, ঘাগরা-পরা গ্রীক, তিব্বতী-পোষাক-পরা রুশ, যেমন 'বোদ্র' হয়, অমনি ফরাসী কোট প্যাণ্টালুনে আবৃত হয়। মেয়েদের ত কথাই নেই, তাদের পয়সা হয়েছে কি পারি রাজধানীর পোষাক পরতে হবেই হবে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মানী এখন ধনী জাত; ও সব দেশে সকলেরই একরকম পোষাক—সেই ফরাসী নকল। তবে আজকাল পারি অপেক্ষা লণ্ডনে পুরুষদের পোষাক ভব্যতর, তাই পুরুষদের পোষাক 'লণ্ডন মেড' আর মেয়েদের পারি-সিয়েন নকল। যাদের বেশী পয়সা, তারা ঐ দুই স্থান হতে তৈয়ারী পোষাক বারমাস ব্যবহার করে। আমেরিকা বিদেশী আমদানী পোষাকের উপর ভয়ানক মাশুল বসায়, সে মাশুল দিয়েও পারি লণ্ডনের পোষাক পর্ত্তে হবে। এ কাজ একা আমেরিকানরা পারে—আমেরিকা এখন কুবেরের প্রধান আড্ডা!

প্রাচীন আর্য্যজাতিরা ধুতি চাদর পরত; ক্ষত্রিয়দের ইজার ও লম্বা জামা, লড়ায়ের সময়। অন্য সময় সকলেরই ধুতি চাদর। কিন্তু পাগড়ীটা ছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মেয়ে মদ্দে পাগড়ী পরত। এখন যেমন বাঙ্গলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কপনী মাত্র থাকলেই শরীর ঢাকার

কাজ হলো, কিন্তু পাগড়ীটা চাই, প্রাচীনকালেও তাই ছিল, মেয়ে মদ্দে। বৌদ্ধদের সময়ের যে সকল ভাস্কর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া যায়, তারা মেয়ে মদ্দে কৌপীন-পরা। বুদ্ধদেবের বাপ কপনী পরে বসেছেন সিংহাসনে; তদ্বৎ মাও বসেছেন—বাড়ার ভাগ, এক পা মল ও এক হাত বালা; কিন্তু পাগড়ী আছে !! সম্রাট ধর্ম্মাশোক ধুতি পরে, চাদর গলায় ফেলে, আদুড় গায়ে, একটা ডমরু আকার আসনে বসে নাচ দেখছেন! নর্ত্তকীরা দিব্যি উলঙ্গ; কোমর থেকে কতকগুলো ন্যাকড়ার ফালি ঝুলছে। মোদ্দা, পাগড়ী আছে। নেবু টেবু সব ঐ পাগড়ীতে। তবে রাজসামন্তরা ইজার ও লম্বা জামা পরা—চোস্ত ইজার ও চোগা। সারথি নলরাজ এমন রথ চালালেন যে, রাজা ঋতুপর্ণের চাদর কোথায় পড়ে রইল; রাজা ঋতুপর্ণ আদুড় গায়ে বে করতে চললেন। ধুতি চাদর আর্য্যদের চিরন্তন পোষাক, এইজন্যই ক্রিয়াকর্ম্মের বেলায় ধুতি চাদর পরতেই হয়।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের পোষাক ছিল ধুতি চাদর; একথান বৃহৎ কাপড় ও চাদর—নাম 'তোগা', তারি অপভ্রংশ এই 'চোগা'। তবে কখনও কখনও একটা পিরহানও পরা হত। যুদ্ধকালে ইজার জামা। মেয়েদের একটা খুব লম্বা চৌড়া চারকোণা জামা, যেমন দুখানা বিছানার চাদর লম্বা লম্বি সেলাই করা, চওড়ার দিক খোলা। তার মধ্যে ঢুকে

কোমরটা বাঁধলে দুবার—একবার বুকের নীচে, একবার পেটের নীচে। তারপর উপরের খোলা দুপাট দু হাতের উপর দু জায়গায় তুলে মোটা ছুঁচ দিয়ে আটকে দিলে—যেমন উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ীরা কম্বল পরে। সে পোযাক অতি সুন্দর ও সহজ।' ওপরে একখান চাদর।

কাটা কাপড় এক ইরাণীরা প্রাচীনকাল হতে পরত। বোধ হয় চীনেদের কাছে শেখে। চীনেরা হচ্ছে সভ্যতার অর্থাৎ ভোগবিলাসের সুখস্বচ্ছন্দতার আদ্‌গুরু। অনাদি কাল হতে চীনে টেবিলে খায়, চেয়ারে বসে, যন্ত্র তন্ত্র কত খাওয়ার জন্য, এবং কাটা পোষাক নানারকম, ইজার জামা টুপিটাপা পরে।

সিকন্দর সা ইরাণ জয় করে, ধুতি চাদর ফেলে ইজার পরতে লাগলেন। তাতে তাঁর স্বদেশী সৈন্যরা এমন চটে গেল যে বিদ্রোহ হবার মত হয়েছিল। মোদ্দা সিকন্দর নাছাড় পুরুষ—ইজার জামা চালিয়ে দিলেন।

গরমদেশে কাপড়ের দরকার হয় না। কৌপীন মাত্রেই লজ্জানিবারণ, বাকি কেবল অলঙ্কার। ঠাণ্ডা দেশে শীতের চোটে অস্থির, অসভ্য অবস্থায় জানোয়ারের ছাল টেনে পরে, ক্রমে কম্বল পরে, ক্রমে জামা পাজামা ইত্যাদি নানান খানা হয়। তারপর আদুড় গায়ে গয়না পর্‌তে গেলেই ত ঠাণ্ডায় মৃত্যু, কাজেই অলঙ্কার-প্রিয়তাটা ঐ

কাপড়ের উপর গিয়ে পড়ে। যেমন আমাদের দেশে গয়নার ফ্যাসন বদলায়, এদের তেমনি ঘড়ি ঘড়ি বদ্‌লাচ্ছে কাপড়ের ফ্যাসান।

ঠাণ্ডা দেশমাত্রেই এজন্য সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গ না ঢেকে কারু সাম্‌নে বেরুবার জো নেই। বিলেতে ঠিক ঠিক পোষাকটি না পরে ঘরের বাইরে যাবার জো নেই। পাশ্চাত্যদেশের মেয়েদের পা দেখান বড়ই লজ্জা কিন্তু গলা ও বুকের খানিকটা দেখান যেতে পারে। আমাদের দেশে মুখ দেখান বড়ই লজ্জা; কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে সাড়ী কোমরে ওঠেন উঠুন, তায় দোষ নেই। রাজপুতানার ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখান!

পাশ্চাত্যদেশের নর্ত্তকী ও বেশ্যারা লোক ভুলাবার জন্য অনাচ্ছাদিত। এদের নাচের মানে, তালে তালে শরীর অনাবৃত করে দেখান। আমাদের দেশের আদুড় গা ভদ্রলোকের মেয়ের; নর্ত্তকী বেশ্যা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। পাশ্চাত্য দেশে মেয়েছেলে সর্ব্বদাই গা ঢাকা, গা আদুড় করলে আকর্ষণ বেশী হয়; আমাদের দেশে দিন রাত আদুড় গা, পোষাক পরে ঢেকেঢুকে থাকলেই আকর্ষণ অধিক। মালাবার দেশে মেয়ে মদ্দের কৌপীনের উপর বহির্ব্বাসমাত্র, আর বস্ত্রমাত্রই নেই। বাঙ্গালীরও তাই, তবে কৌপীন নাই এবং পুরুষদের সাক্ষাতে মেয়েরা গাটা মুড়ি ঝুড়ি দিয়ে ঢাকে।

পাশ্চাত্যদেশে পুরুষে পুরুষে সর্ব্বাঙ্গ অক্লেশে উলঙ্গ হয়—আমাদের মেয়েদের মত। বাপ ছেলেয় সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ করে স্নানাদি করে, দোষ নাই। কিন্তু মেয়েদের সামনে, বা রাস্তা ঘাটে, বা নিজের ঘর ছাড়া, সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা চাই।

এক চীনে ছাড়া সর্ব্বদেশেই এ লজ্জা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বিষয় দেখছি—কোনও বিষয়ে বেজায় লজ্জা, আবার তদপেক্ষা অধিক লজ্জাকর বিষয়ে আদতে লজ্জা নেই। চীনে মেয়ে মদ্দে সর্ব্বদা আপাদমস্তক ঢাকা। চীনে কনফুছের চেলা, বুদ্ধের চেলা, বড় নীতি দুরস্ত। খারাপ কথা, চাল, চলন—তৎক্ষণাৎ সাজা। কৃশ্চান পাদ্রী গিয়ে চীনে ভাষায় বাইবেল ছাপিয়ে ফেললে। এখন বাইবেল পুরাণ হচ্ছেন হিঁদুর পুরাণের চোদ্দ পুরুষ—সে দেবতা মানুষের অদ্ভুত কেলেঙ্কার পড়ে চীনে ত চটে অস্থির। বললে, 'এই বই কিছুতেই এদেশে চালান হবে না, এ—ত—অতি অশ্লীল কেতাব'; তার উপর পাদ্রিনী বুকখোলা সান্ধ্য পোষাক পরে, পর্দ্দার বার হয়ে, চীনেদের নিমন্ত্রণে আহ্বান করলেন। চীনে মোটা বুদ্ধি, বললে—'সর্ব্বনাশ! এই খারাপ বই পড়িয়ে, আর এই মাগীদের আদুড় গা দেখিয়ে, আমাদের ছোঁড়া বইয়ে দিতে এ ধর্ম্ম এসেছে।' এই হচ্ছে চীনের কৃশ্চানের উপর মহাক্রোধ। নতুবা চীনে কোনও ধর্ম্মের উপর আঘাত করে না। শুনছি যে, পাদ্রীরা এখন অশ্লীল অংশ ত্যাগ

করে বাইবেল ছাপিয়েছে; কিন্তু চীনে তাতে আরও সন্দিহান।

আবার এ পাশ্চাত্যদেশে, দেশবিশেষে লজ্জাঘেন্নার তারতম্য আছে। ইংরেজ আমেরিকানের লজ্জা সরম এক রকম, ফরাসীর আর একরকম; জর্ম্মানের আর একরকম। রুশ আর তিব্বতী বড় কাছাকাছি; তুরস্কের আর এক ঢোল; ইত্যাদি।

আমাদের দেশের চেয়ে ইউরোপে ও আমেরিকায় মল-মূত্রাদি ত্যাগে বড়ই লজ্জা। আমরা হচ্ছি নিরামিষভোজী—এক কাঁড়ি ঘাস পাতা আহার। আবার বেজায় গরম দেশ, এক দমে লোটাভর জল খাওয়া চাই। পশ্চিমী চাষা সেরভর ছাতু খেলে; তারপর পাতকোকে পাতকোই খালি করে ফেললে, জল খাওয়ার চোটে। গরমী কালে আমরা বাঁশ বার করে দিই, লোককে জল খাওয়াতে। কাজেই সে সব যায় কোথা, বল? দেশ বিষ্ঠামূত্রময় না হয়ে যায় কোথা? গরুর গোয়াল, ঘোড়ার আস্তাবল, আর বাঘ সিঙ্গির পিঁজরার তুলনা কর দিকি!

চালচলন

কুকুর আর ছাগলের তুলনা কর দিকি? পাশ্চাত্য দেশের আহার মাংসময়, কাজেই অল্প; আর ঠাণ্ডা দেশে জল খাওয়া নেই বল্লেই হয়। ভদ্রলোকের খুদে খুদে গ্লাসে একটু মদ খাওয়া। ফরাসীরা জলকে বলে ব্যাঙের রস, তা

কি খাওয়া চলে ? এক আমেরিকান জল খায় কিছু বেশী, কারণ ওদের দেশ গরমীকালে ভয়ঙ্কর গরম, নিউইয়র্ক কলকেতার চেয়েও গরম। আর জর্ম্মানরা বড্ড 'বিয়র' পান করে—কিন্তু সে খাবার সঙ্গে নয় বড়।

ঠাণ্ডা দেশে সর্দ্দি লাগবার সদাই সম্ভাবনা ; গরম দেশে খেতে বসে ঢক্ ঢক্ জল। এরা কাজেই না হেঁচে যায় কোথা আর আমরা ঢেঁকুর না তুলেই বা যাই কোথা ? এখন দেখ নিয়ম—এ দেশে খেতে বসে যদি ঢেঁকুর তুলেছ, ত সে বেয়াদবীর আর পার নেই। কিন্তু রুমাল বার করে তাতে ভড় ভড় করে সিক্‌নি ঝাড়, এদের তায় ঘেন্না হয় না। আমাদের ঢেঁকুর না তুললে নিমন্ত্রক খুসীই হন না ; কিন্তু পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে খেতে ভড় ভড় করে সিক্‌নি ঝাড়াটা কেমন ?

ইংলণ্ডে আমেরিকায় মলমূত্রের নামটি আনবার জো নেই মেয়েদের সামনে। পাইখানায় যেতে হবে চুরি করে। পেট গরম হয়েছে, বা পেটের কোনও প্রকার অসুখের কথা মেয়েদের সামনে বলবার জো নেই, অবশ্য বুড়ী টুড়ি আলাপী আলাদা কথা। মেয়েরা মলমূত্র চেপে মরে যাবে, তবুও পুরুষের সামনে ও নামটিও আনবে না।

ফরাসী দেশে অত নয়। মেয়েদের মলমূত্রের স্থানের পাশেই পুরুষদের ; এরা এ দোর দিয়ে যাচ্ছে, ওরা ও দোর

দিয়ে যাচ্ছে; অনেক স্থানে এক দোর, ঘর আলাদা। রাস্তার দু ধারে মাঝে মাঝে প্রস্রাবের স্থান, তা খালি পিঠটা ঢাকা পড়ে মাত্র, মেয়েরা দেখছে, তায় লজ্জা নাই, —আমাদের মত। অবশ্য মেয়েরা অমন অনাবৃত স্থানে যায় না। জর্ম্মানদের আরও কম।

ইংরেজ আমেরিকানরা কথাবার্ত্তায়ও বড় সাবধান, মেয়েদের সামনে। সে ঠ্যাঙ্ বলবার পর্য্যন্ত জো নেই। ফরাসীরা আমাদের মত মুখ খোলা; জর্ম্মান, রুশ প্রভৃতি সকলের সামনে খিস্তি করে।

কিন্তু প্রেম প্রণয়ের কথা অবাধে মায় ছেলে, ভায়ে বোনে বাপে—তা চলেছে। বাপ মেয়ের প্রণয়ীর (ভবিষ্যৎ বরের) কথা নানা রকম ঠাট্টা করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে। ফরাসীর মেয়ে তায় অবনতমুখী, ইংরেজের মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিনের মেয়ে চোটপাট জবাব দিচ্ছে। চুম্বন, আলিঙ্গনটা পর্য্যন্ত দোষাবহ নয়, অশ্লীল নয়। সে সব কথা কওয়া চলে। আমেরিকায় পরিবারের পুরুষবন্ধুও আত্মীয়তা হলে, বাড়ীর যুবতী মেয়েদেরও স্তেকহ্যাণ্ডের স্থলে চুম্বন করে। আমাদের দেশে প্রেম প্রণয়ের নাম গন্ধটি পর্য্যন্ত গুরুজনের সামনে হবার জো নেই।

এদের অনেক টাকা। অতি পরিষ্কার এবং কেতাদোরস্ত কাপড় না পরলে সে ছোটলোক,—তার সমাজে যাবার

জো নেই। প্রত্যহ ধোপদস্ত কামিজ, কলার প্রভৃতি দুবার তিনবার বদলাতে হবে ভদ্রলোককে! গরীবরা অত শত পারে না; ওপরের কাপড়ে একটি দাগ, একটি কোঁচকা থাকলেই মুস্কিল। নখের কোণে, হাতে, মুখে একটু ময়লা থাকলেই মুস্কিল। গরমীতে পচেই মর, আর যাই হক; দস্তানা পরে যেতেই হবে, নইলে রাস্তায় হাত ময়লা হয় এবং সে হাত কোন স্ত্রীলোকের হাতে দিয়ে সম্ভাষণ করাটা অতি অভদ্রতা। ভদ্রসমাজে থুথু ফেলা বা কুলকুচো করা বা দাঁত খোঁটা ইত্যাদি করলে তৎক্ষণাৎ চণ্ডালত্বপ্রাপ্তি !!

ধর্ম্ম এদের শক্তিপূজা, আধা বামাচার রকমের; পঞ্চ মকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে। 'বামে বামা . . . দক্ষিণে পানপাত্রং . . . অগ্রে ন্যস্তং মরীচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসং . . . কৌলো ধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ'।* প্রকাশ্য, সর্ব্বসাধারণ, শক্তিপূজা বামাচার,—মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেষ্ট্যাণ্ট ত ইউরোপে নগণ্য—ধর্ম্ম ত ক্যাথলিক। সে ধর্ম্মে জিহোবা, যীশু, ত্রিমূর্ত্তি, সব অন্তর্দ্ধান, জেগে বসেছেন 'মা'! শিশু-যীশু-কোলে 'মা'। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে, অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে 'মা' 'মা'

পাশ্চাত্য ধর্ম্ম শক্তিপূজা

---

* আনন্দ-স্তোত্রম্

'মা'! বাদ্‌সা ডাকছে 'মা', জঙ্গ বাহাদুর (Field-martial) সেনাপতি ডাকছে 'মা', ধ্বজাহস্তে সৈনিক ডাকছে 'মা', পোতবক্ষে নাবিক ডাকছে 'মা', জীর্ণবস্ত্র ধীবর ডাকছে 'মা', রাস্তার কোণে ভিখারী ডাকছে 'মা'। 'ধন্য মেরী', 'ধন্য মেরী' দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে।

আর মেয়ের পূজো। এ শক্তিপূজো কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তিপূজো কুমারী-সধবা-পূজো আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়—সেই শক্তিপূজো। তবে আমাদের পূজো ঐ তীর্থস্থানেই, সেইক্ষণ মাত্র; এদের দিনরাত, বার মাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চ স্থান, আদর, খাতির। এ যে সে স্ত্রীলোকের পূজো, চেনা অচেনার পূজো, ভদ্রকুলের ত কথাই নাই, রূপসী যুবতীর ত কথাই নাই। এ পূজো ইউরোপে আরম্ভ করে মূরেরা, মুসলমান আরবমিশ্র মূরেরা, যখন তারা স্পেন বিজয় করে আট শতাব্দী রাজত্ব করে, সেই সময়। তাদের থেকে ইউরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তিপূজার অভ্যুদয়। মূর ভুলে গেল, শক্তিহীন শ্রীহীন হল। স্বস্থানচ্যুত হয়ে আফ্রিকার কোণে অসভ্যপ্রায় হয়ে বাস করতে লাগলো, আর সে শক্তির সঞ্চার হলো ইউরোপে, 'মা' মুসলমানকে ছেড়ে উঠলেন কৃশ্চানের ঘরে।

এ ইউরোপ কি? কালো, আদ্‌কালা, হল্‌দে, লাল, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার সমস্ত মানুষ এদের পদানত কেন? এরা কেনই বা এ কলিযুগের একাধিপতি?

এ ইউরোপ বুঝতে গেলে পাশ্চাত্যধর্ম্মের আকর ফ্রাঁস থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইউরোপে, ইউরোপের মহাকেন্দ্র পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোক আঁধার, ভাল মন্দ; সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এইখানে—এই পারি নগরীতে।

ফ্রাঁস—পারি

এ পারি এক মহাসমুদ্র—মণি, মুক্তা, প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক। এই ফ্রাঁস ইউরোপের কর্ম্মক্ষেত্র। সুন্দর দেশ—চীনের কতক অংশ ছাড়া, এমন দেশ আর কোথাও নেই। নাতিশীতোষ্ণ, অতি উর্ব্বরা, অতিবৃষ্টি নাই, অনাবৃষ্টিও নাই, সে নির্ম্মল আকাশ, মিঠে রৌদ্র, ঘাসের শোভা, ছোট ছোট পাহাড়, চিনার বাঁশ প্রভৃতি গাছ, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট প্রস্রবণ সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্মত্ততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্য্যপ্রিয়। আবাল-বৃদ্ধবনিতা, ধনী দরিদ্র, তাদের ঘর দোর ক্ষেত ময়দান, ঘসে মেজে, সাজিয়ে গুজিয়ে ছবিখানি করে রাখছে। এক জাপান ছাড়া, এ ভাব আর কোথাও নাই। সেই ইন্দ্রভুবন

অট্টালিকাপুঞ্জ, নন্দনকানন উদ্যান, উপবন—মায় চাষার ক্ষেত, সকলের মধ্যে একটু রূপ; একটু সুচ্ছবি দেখবার চেষ্টা এবং সফলও হয়েছে। এই ফ্রাঁস প্রাচীনকাল হতে গোলওয়া (Gaulois), রোমক, ফ্রাঁ (Franks) প্রভৃতি জাতির সংঘর্ষভূমি; এই ফ্রাঁ জাতি রোমসাম্রাজ্যের বিনাশের পর ইউরোপে একাধিপত্য লাভ করলে, এদের বাদ্‌সা শার্লামাঞ্ঝন ইউরোপে কৃশ্চান ধর্ম্ম তলোয়ারের দাপটে চালিয়ে দিলেন, এই ফ্রাঁ জাতি হতেই আসিয়াখণ্ডে ইউরোপের প্রচার,—তাই আজও ইউরোপী আমাদের কাছে ফ্রাঁকি, ফেরিঙ্গি, প্লাঁকি, ফিলিঙ্গি, ইত্যাদি।

সভ্যতার আকর প্রাচীন গ্রীক ডুবে গেল। রাজচক্রবর্ত্তী রোম বর্ব্বর আক্রমণ-তরঙ্গে তলিয়ে গেল। ইউরোপের আলো নিবে গেল, এদিকে আর এক অতি বর্ব্বরজাতির আসিয়াখণ্ডে প্রাদুর্ভাব হল—আরবজাতি। মহাবেগে সে আরব-তরঙ্গ পৃথিবী ছাইতে লাগল। মহাবল পারস্য আরবের পদানত হল, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হল, কিন্তু তার ফলে মুসলমান ধর্ম্ম আর একরূপ ধারণ করলে; সে আরবি ধর্ম্ম আর পারসিক সভ্যতা সম্মিলিত হলো।

আরবের তলওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে পারস্য সভ্যতা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যে পারস্য সভ্যতা প্রাচীন গ্রীস ও ভারতবর্ষ হতে নেওয়া। পূর্ব্ব পশ্চিম, দুদিক হতে

মহাবলে মুসলমান তরঙ্গ ইউরোপের উপর আঘাত করলে, সঙ্গে সঙ্গে বর্ব্বর অন্ধ ইউরোপে জ্ঞানালোক ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। প্রাচীন গ্রীকদের বিদ্যা বুদ্ধি শিল্প বর্ব্বরাক্রান্ত ইতালীতে প্রবেশ করলে, ধরারাজধানী রোমের মৃতশরীরে প্রাণস্পন্দন হতে লাগলো—সে স্পন্দন ফ্লরেন্স নগরীতে প্রবল রূপ ধারণ করলে, প্রাচীন ইতালী নবজীবনে বেঁচে উঠতে লাগলো,—এর নাম রেনেসাঁ (Renaissance), নব জন্ম। কিন্তু সে নব জন্ম হলো ইতালীর। ইউরোপের অন্যান্য অংশের তখন প্রথম জন্ম। সে কৃশ্চানী ষোড়শ শতাব্দীতে যখন আকবর, জাহাঁগির, সাজাহাঁ প্রভৃতি মোগল সম্রাট ভারতে মহাবল সাম্রাজ্য তুলেছেন, সেই সময় ইউরোপের জন্ম হল।

ইতালী বুড়ো জাত, একবার সাড়াশব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। সে সময় নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল্ কিছু, আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত, নানা কারণে আবার পাশ ফিরে শুলো।

ইউরোপে, ইতালীর পুনর্জন্ম গিয়ে লাগলো বলবান্, অভিনব নূতন ফ্রাঁ জাতিতে। চারিদিক হতে সভ্যতার ধারা সব এসে ফ্লরেন্স নগরীতে একত্র হয়ে নূতন রূপ ধারণ করলে; কিন্তু ইতালী জাতিতে সে বীর্য্য ধারণের

শক্তি ছিল না, ভারতের মত সে উন্মেষ ঐখানেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু ইউরোপের সৌভাগ্য, এই নূতন ফ্রাঁ জাতি আদরে সে তেজ গ্রহণ করলে। নবীন রক্ত, নবীন জাত সে তরঙ্গে মহাসাহসে নিজের তরণী ভাসিয়ে দিলে, সে স্রোতের বেগ ক্রমশঃই বাড়তে লাগলো, সে এক ধারা শতধারা হয়ে বাড়তে লাগলো; ইউরোপের আর আর জাতি লোলুপ হয়ে খাল কেটে সে জল আপনার আপনার দেশে নিয়ে গেল এবং তাতে নিজেদের জীবনীশক্তি ঢেলে তার বেগ, তার বিস্তার বাড়াতে লাগলো. ভারতে এসে সে তরঙ্গ লাগলো; জাপান সে বন্যায় বেঁচে উঠলো, সে জল পান করে মত্ত হয়ে উঠলো; জাপান আসিয়ার নূতন জাত।

এই পারি নগরী সে ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দনগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ না লণ্ডনে, না বার্লিনে, না আর কোথায়। লণ্ডনে, নিউইয়র্কে ধন আছে; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট; নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্ব্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন থাক, বিদ্যাবুদ্ধি থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও থাক—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক মরে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা আবার অতি গম্ভীর,

সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসী মুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।

এই পারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞান সভা এদের একাডেমির নকল; এই পারি ঔপনিবেশ-সাম্রাজ্যের গুরু, সকল ভাষাতেই যুদ্ধশিল্পের সংজ্ঞা এখনও অধিকাংশ ফরাসী; এদের রচনার নকল, সকল ইউরোপী ভাষায়; দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের এই পারি খনি, সকল জায়গায় এদের নকল।

এরা হচ্ছে সহুরে, আর সব জাত যেন পাড়াগেঁয়ে। এরা যা করে, তা ৫০ বৎসর, ২৫ বৎসর পরে জর্ম্মান ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিদ্যায় হক, বা শিল্পে হক, বা সমাজ-নীতিতেই হক। এই ফরাসী সভ্যতা স্কটল্যাণ্ডে লাগলো, স্কটরাজ ইংলণ্ডের রাজা হলেন, ফরাসী সভ্যতা ইংলণ্ডকে জাগিয়ে তুললে;—স্কটরাজ ষ্টুয়ার্ট বংশের সময় ইংলণ্ডে রয়াল সোসাইটি প্রভৃতির সৃষ্টি।

আর এই ফ্রাঁস স্বাধীনতার আবাস। প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারি নগরী হতে ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে, সেই দিন হতে ইউরোপের নূতন মূর্ত্তি হয়েছে। সে 'এগালিতে, লিবার্ত্তে, ফ্রাতের্নিতে'র (Egalite´ liberte´ fraternite´)—ধ্বনি ফ্রাঁস হতে চলে গেছে; ফ্রাঁস

অন্যভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য জাত এখনও সেই ফরাসী বিপ্লব মক্স করছে।

একজন স্কটল্যাণ্ড দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমায় সেদিন বললেন যে, পারি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র ; যে দেশ যে পরিমাণে এই পারি নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতি লাভ করবে। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত সত্য ; কিন্তু এ কথাটাও সত্য যে, যদি কারু কোনও নূতন ভাব এ জগৎকে দেবার থাকে ত এই পারি হচ্ছে সে প্রচারের স্থান। এই পারিতে যদি ধ্বনি ওঠে ত ইউরোপ অবশ্যই প্রতিধ্বনি করবে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, নর্ত্তকী এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে, আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠা হয়।

আমাদের দেশে এই পারি নগরীর বদনামই শুনতে পাওয়া যায়,—এ পারি মহাকদর্য্য বেশ্যাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্য এ কথা ইংরেজরাই বলে থাকে, এবং অন্য দেশের যে সব লোকের পয়সা আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দ্বিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব, তারা অবশ্য বিলাসময় জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারিই দেখে !

কিন্তু লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্কও ঐ বারবণিতা-পূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপূর্ণ ; তবে তফাৎ এই যে, অন্য দেশের

ইন্দ্রিয়চর্চ্চা পশুবৎ, পারিসের, সভ্য পারির ময়লা সোণার পাতমোড়া ; বুনোশোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখম-ধরা নাচে যে তফাৎ, অন্যান্য সহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ পারিস বিলাসের সেই তফাৎ।

ভোগ বিলাসের ইচ্ছা কোন্ জাতে নেই বল ? নইলে দুনিয়ায় যার দুপয়সা হয়, সে অমনি পারি নগরী অভিমুখে ছোটে কেন ? রাজা বাদসারা চুপিসাড়ে নাম ভাঁড়িয়ে এ বিলাস-বিবর্ত্তে স্নান করে পবিত্র হতে আসেন কেন ? ইচ্ছা সর্ব্বদেশে, উদ্যোগের ত্রুটি কোথাও কম দেখি না ; তবে এরা সুসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ করতে জানে, বিলাসের সপ্তমে পৌঁছেছে।

তাও অধিকাংশ কদর্য্য নাচ তামাসা বিদেশীর জন্য। ফরাসী বড় সাবধান, বাজে খরচ করে না। এই ঘোর বিলাস, এই সব হোটেল, কাফে, যাতে একবার খেলে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়, এসব বিদেশী আহাম্মক ধনীদের জন্য। ফরাসীরা বড় সুসভ্য, আদব কায়দা বেজায়, খাতির খুব করে; পয়সাগুলি সব বার করে নেয়, আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁসে।

তা ছাড়া, আর এক তামাসা এই যে, আমেরিকান, জর্ম্মান, ইংরেজ প্রভৃতির খোলা সমাজ, বিদেশী ঝাঁ করে সব দেখ্‌তে শুনতে পায়। দু চার দিনের আলাপেই

আমেরিকান বাড়ীতে দশ দিন বাস কর্ব্বার নিমন্ত্রণ করে; জর্ম্মান তদ্রূপ; ইংরেজ একটু বিলম্বে। ফরাসী এ বিষয়ে বড় তফাৎ, পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত না হলে, আর বাস করতে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু যখন বিদেশী ঐ প্রকার সুবিধা পায়, ফরাসী পরিবার দেখবার জানবার অবকাশ পায়, তখন আর এক ধারণা হয়। বলি, মেছবাজার দেখে অনেক বিদেশী যে আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে—সেটা কেমন আহাম্মকি? তেমনি এ পারি। অবিবাহিতা মেয়ে এদেশে আমাদের দেশের মত সুরক্ষিতা, তারা সমাজে প্রায় মিশতে পায় না। বের পর তবে নিজের স্বামীর সঙ্গে সমাজে মেশে; বে থা মায়ে বাপে দেয়, আমাদের মত। আর এরা আমোদপ্রিয়, কোনও বড় সামাজিক ব্যাপার নর্ত্তকীর নাচ না হলে সম্পূর্ণ হয় না। যেমন আমাদের বে, পূজো সর্ব্বত্রে নর্ত্তকীর আগমন। ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ, ওদের মতে এ বড় অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটারে হলে আর দোষ নেই। একথাটাও বলি যে, এদের নাচটা আমাদের চোখে অশ্লীল বটে, তবে এদের সয়ে গেছে। নেংটি নাচ সর্ব্বত্রে, ও গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু ইংরেজ আমেরিকান দেখতেও ছাড়বে না, আর ঘরে গিয়ে গাল দিতেও ছাড়বে না।

স্ত্রী-সম্বন্ধী আচার

স্ত্রী সম্বন্ধী আচার পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই একরূপ অর্থাৎ পুরুষ মানুষের অন্য স্ত্রীসংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাটায় মুস্কিল। তবে ফরাসী পুরুষ একটু খোলা, অন্য দেশের ধনী লোকেরা যেমন এ সম্বন্ধে বেপরোয়া, তেমনি। আর ইউরোপী পুরুষসাধারণ ও বিষয়টা অত দোষের ভাবে না। অবিবাহিতের ও বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশে বড় দোষের নয়; বরং বিদ্যার্থী যুবক ও বিষয়ে একান্ত বিরত থাকলে অনেক স্থলে তার মা বাপ দোষাবহ বিবেচনা করে; পাছে ছেলেটা 'মেনিমুখো' হয়। পুরুষের একগুণ পাশ্চাত্যদেশে চাই—সাহস; এদের 'ভার্চ্চু' (virtue) শব্দ আর আমাদের 'বীরত্ব' একই শব্দ। ঐ শব্দের ইতিহাসেই দেখ, এরা কাকে পুরুষের সততা বলে। মেয়ে মানুষের পক্ষে সতীত্ব অত্যাবশ্যক বটে।

এ সকল কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জাতির এক একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেই-খানটা হতে সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুই ভুল।

আমাদের উদ্দেশ্য এ বিষয়ে এদের ঠিক উল্টা, আমাদের

ব্রহ্মচারী (বিদ্যার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার্থী আর কামজিৎ একই কথা।

আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য্য বিনা তা কেমনে হয়, বল ? এদের উদ্দেশ্য ভোগ, ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক তত নাই ; তবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ হলে ছেলেপিলে জন্মায় না এবং সমগ্র জাতির ধ্বংস। পুরুষ মানুষে দশ গণ্ডা বে করলে তত ক্ষতি নাই, বরং বংশ বৃদ্ধি খুব হয়। স্ত্রীলোকের একটা ছাড়া আর একটা এক সঙ্গে চলে না—ফল বন্ধ্যাত্ব। কাজেই সকল দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর বিশেষ আগ্রহ, পুরুষের বাড়ার ভাগ। 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।'*

যাক, মোদ্দা এমন সহর আর ভূমণ্ডলে নাই। পূর্ব্ব-কালে এ সহর ছিল আর একরূপ, ঠিক আমাদের কাশীর বাঙ্গালীটোলার মত। আঁকাবাঁকা গলি রাস্তা, মাঝে মাঝে দুটো বাড়ী এক করা খিলান, দেলের গায়ে পাতকো, ইত্যাদি। এবারকার একজিবিশনে একটা ছোট পুরাণ পারি তৈরী করে দেখিয়েছে। সে পারি কোথায় গেছে, ক্রমিক বদলেছে, এক একবার লড়াই বিদ্রোহ হয়েছে, কতক অংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, আবার পরিষ্কার নূতন ফর্‌দা পারি সেই স্থানে উঠেছে।

---

* গীতা ৩৩৩

বর্ত্তমান পারি অধিকাংশই তৃতীয় ন্যাপোলেঅঁর তৈরী। তৃ-ন্যাপোলেঅঁ মেরে কেটে জুলুম করে বাদ্‌সা হলেন। ফরাসী সেই প্রথম বিপ্লব হওয়া অবধি সতত টল্‌মল্‌; কাজেই বাদ্‌সা, প্রজাদের খুসী রাখবার জন্য, আর পারি নগরীর সতত চঞ্চল গরীব লোকদের কাজ দিয়ে খুসী করবার জন্য ক্রমাগত রাস্তা ঘাট তোরণ থিয়েটার প্রভৃতি গড়তে লাগলেন। অবশ্য, পারির সমস্ত পুরাতন মন্দির তোরণ স্তম্ভ প্রভৃতি রৈল। রাস্তা ঘাট সব নূতন হয়ে গেল। পুরাণ সহর—পগার পাঁচিল সব ভেঙ্গে বুলভারের অভ্যুদয় হতে লাগলো এবং তা হতেই এ সহরের সর্ব্বোত্তম রাস্তা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শাঁজেলিজে রাস্তা তৈরী হল। এ রাস্তা এত বড় চওড়া যে, মধ্যখানে এবং দুপাশ দিয়ে বাগান চলেছে এবং একস্থানে অতি বৃহৎ গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার নাম প্লাস্‌ দ লা কনকর্দ (Place de la concorde)। এই প্লাস্‌ দ লা কনকর্দের চারিদিকে প্রায় সমান্তরালে ফ্রাঁসের প্রত্যেক জেলার এক এক বান্ত্রিক নারীমূর্ত্তি। তার মধ্যে একটি মূর্ত্তি হচ্ছে ষ্ট্রাস-বুর্গ নামক জেলার। ঐ জেলা এখন ডইচ্‌ (জর্ম্মান)-রা ১৮৭২ সালের লড়ায়ের পর হতে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সে দুঃখ ফ্রাঁসের আজও যায় না, সে মূর্ত্তি দিনরাত প্রেতোদ্দিষ্ট ফুলমালায় ঢাকা। যে রকমের মালা লোকে আত্মীয় স্বজনের গোরের ওপর দিয়ে আসে,

সেই রকম বৃহৎ মালা দিনরাত সে মূর্ত্তির উপর কেউ না কেউ দিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লীর চাঁদনিচৌক কতক অংশে এই প্লাস্ দ লা কনকর্দের মত এককালে ছিল বলে বোধ হয়। স্থানে স্থানে জয়স্তম্ভ বিজয়তোরণ আর বিরাট নরনারী সিংহাদি ভাস্কর্য্য মূর্ত্তি। মহাবীর প্রথম ন্যাপোলেঁঅঁর স্মারক এক সুবৃহৎ ধাতুনির্ম্মিত বিজয়স্তম্ভ। তার গায়ে ন্যালোলেঅঁর সময়ের যুদ্ধ বিজয় অঙ্কিত। ওপরে তাঁর মূর্ত্তি। আর একস্থানে প্রাচীন দুর্গ বাস্তিল (Bastille) ধ্বংসের স্মারক চিহ্ন। তখন রাজাদের একাধিপত্য ছিল, যাকে তাকে যখন তখন জেলে পুরে দিত। বিচার না, কিছু না, রাজা এক হুকুম লিখে দিতেন; তার নাম লেটর্ দ ক্যাশে—মানে, রাজমুদ্রাঙ্কিত লিপি। তারপর সে ব্যক্তি আর কি করেছে কিনা, দোষী কি নির্দ্দোষী, তার আর জিজ্ঞাসা-পড়া নেই, একেবারে নিয়ে পুরলে সেই বাস্তিলে;—সেখান থেকে বড় কেউ আর বেরুত না। রাজাদের প্রণয়িনীরা কারুর উপর চট্‌লে রাজার কাছ থেকে ঐ শীলটা করিয়ে নিয়ে সে ব্যক্তিকে বাস্তিলে ঠেলে দিত। পরে যখন দেশশুদ্ধ লোক এ সব অত্যাচারে ক্ষেপে উঠলো, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সব সমান, ছোট বড় কিছুই নয়, এ ধ্বনি উঠাল, পারির লোক উন্মত্ত হয়ে রাজারাণীকে আক্রমণ করলে, সে সময় প্রথমেই এ

মানুষের অত্যাচারের ঘোর নিদর্শন বাস্তিল ভূমিসাৎ করলে, সে স্থানটায় এক রাত ধরে নাচগান আমোদ করলে। তারপর রাজা পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ধরে ফেললে, রাজার শ্বশুর অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌সা জামায়ের সাহায্যে সৈন্য পাঠাচ্ছেন শুনে, প্রজারা ক্রোধে অন্ধ হয়ে রাজারাণীকে মেরে ফেললে, দেশশুদ্ধ লোকে 'স্বাধীনতা সাম্যের' নামে মেতে উঠলো, ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল, অভিজাত ব্যক্তির মধ্যে যাকে ধরতে পারলে তাকেই মেরে ফেললে, কেউ কেউ উপাধি টুপাধি ছেড়ে প্রজার দলে মিশে গেল। শুধু তাই নয়, বললে 'দুনিয়া শুদ্ধ লোক তোমরা ওঠ, রাজা ফাজা অত্যাচারী সব মেরে ফেল, সব প্রজা স্বাধীন হক, সকলে সমান হক!' তখন ইউরোপ শুদ্ধ রাজারা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলো—এ আগুন পাছে নিজেদের দেশে লাগে, পাছে নিজেদের সিংহাসন গড়িয়ে পড়ে যায়, তাই তাকে নেবাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে চারিদিক থেকে ফ্রাঁস আক্রমণ করলে। এদিকে প্রজাতন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষেরা 'লা পাত্রি আ দাঁজে'—'জন্মভূমি বিপদে', এই ঘোষণা করে দিলে; সে ঘোষণা আগুনের মত দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। ছেলেবুড়ো, মেয়েমদ্দে 'মার্সাইএ' মহাগীত গাইতে গাইতে,—উৎসাহপূর্ণ ফ্রাঁসের মহাগীত গাইতে গাইতে, দলে দলে, জীর্ণবসন, সে শীতে নগ্নপদ, অত্যল্পান্ন ফরাসী প্রজা ফৌজ বিরাট সমগ্র ইউরোপী

চমূর সম্মুখীন হল, বড় ছোট ধনী দরিদ্র সব বন্দুক ঘাড়ে বেরুল—'পরিত্রাণায়....বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'* বেরুল। সমগ্র ইউরোপ সে বেগ সহ্য করতে পারলে না। ফরাসী জাতির অগ্রে সৈন্যদের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে এক বীর,—তাঁর অঙ্গুলি হেলনে ধরা কাঁপতে লাগল, তিনিই ন্যাপোলেঁঅঁ।

স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, বন্দুকের নালমুখে, তলওয়ারের ধারে ইউরোপের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়ে দিলে, তিন-রঙা ককার্ডের জয় হল। তারপর, ন্যাপোলেঁঅঁ ফ্রাঁস মহারাজ্যকে দৃঢ়বদ্ধ সাবয়ব করবার জন্য বাদ্‌সা হলেন। তারপর তাঁর কার্য্য শেষ হল, ছেলে হল না বলে সুখ দুঃখের সঙ্গিনী ভাগ্যলক্ষ্মী রাজ্ঞী জোসেফিন্‌কে ত্যাগ করলেন, অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌সার মেয়ে বে করলেন। জোসেফিনের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাগ্য ফিরল, রুশ জয় কর্ত্তে গিয়ে বরফে তাঁর ফৌজ মারা গেল। ইউরোপ বাগ্‌ পেয়ে তাঁকে জোর করে সিংহাসন ত্যাগ করিয়ে একটা দ্বীপে পাঠিয়ে দিলে, পুরাণ রাজার বংশের একজনকে তক্তে বসালে।

মরা সিঙ্গি সে দ্বীপ থেকে পালিয়ে আবার ফ্রাঁসে হাজির হল, ফ্রাঁসশুদ্ধ লোক আবার তাঁকে মাথায় করে নিলে, রাজা পালাল। কিন্তু অদৃষ্ট ভেঙ্গেছে, আর জুড়ল না—আবার ইউরোপ শুদ্ধ পড়ে, তাঁকে হারিয়ে দিলে,

* গীতা ৪।৮

ন্যাপোলেঅঁ ইংরেজদের এক জাহাজে উঠে শরণাগত হলেন; ইংরেজরা তাঁকে সেণ্ট হেলেনা নামক দূর একটা দ্বীপে বন্দী রাখলে—আমরণ। আবার পুরাণ রাজা এল, তার ভাইপো রাজা হল। আবার ফ্রাঁসের লোক ক্ষেপে উঠলো, রাজা ফাজা তাড়িয়ে দিলে, আবার প্রজাতন্ত্র হল। মহাবীর ন্যাপোলেঅঁর এক ভাইপো এ সময়ে ক্রমে ফ্রাঁসের প্রীতি-পাত্র হলেন, ক্রমে একদিন ষড়যন্ত্র করে নিজেকে বাদ্‌সা ঘোষণা করলেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় ন্যাপোলেঅঁ; দিন কতক তাঁর খুব প্রতাপ হল। কিন্তু জর্ম্মান যুদ্ধে হেরে তাঁর সিংহাসন গেল, আবার ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল। সেই অবধি প্রজাতন্ত্র চলেছে।

ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের মূলভিত্তিস্বরূপ পরিণামবাদ —Evolution Theory

যে পরিণামবাদ ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি, এখন সে পরিণামবাদ ইউরোপী বহির্বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে। ভারত ছাড়া অন্যত্র সকল দেশের ধর্ম্মে ছিল এই যে, দুনিয়াটা সব টুক্‌রা টুক্‌রা, আলাদা আলাদা। ঈশ্বর একজন আলাদা, প্রকৃতি একটা আলাদা, মানুষ একটা আলাদা, ঐ রকম পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, গাছ-পালা, মাটি, পাথর ধাতু প্রভৃতি সব আলাদা আলাদা! ভগবান ঐ রকম আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন।

জ্ঞান মানে কি না বহুর মধ্যে এক দেখা। যেগুলো আলাদা, তফাৎ বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধে এই ঐক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে 'নিয়ম' বলে; এরি নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

পূর্ব্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্ম্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল; ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে; মাটি, পাথর, গাছপালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং—এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে। অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমায় পৌঁছুলেন, বল্লেন যে, সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ এক, তার নাম 'ব্রহ্ম'; আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন 'মায়া', 'অবিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞান। এই হল জ্ঞানের চরম সীমা।

ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দাও, বিদেশে যদি এ কথাটা এখন কেউ বুঝতে না পারে, ত তাকে আর পণ্ডিত কি করে বলি। মোদ্দা, এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছে, এদের রকম দিয়ে,—জড় বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে। তা সে 'এক' কেমন করে 'বহু' হল, এ কথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি যে,

ওখানটা বুদ্ধির অতীত। এরাও তাই করেছে। তবে সে 'এক' কি কি রকম হয়েছে, কি কি রকম জাতিত্ব ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এইটার খোঁজের নাম বিজ্ঞান (Science)।

কাজেই এখন এদেশে প্রায় সকলেই পরিণামবাদী,—Evolutionist. যেমন ছোট জানোয়ার বদ্‌লে বদ্‌লে বড় জানোয়ার হচ্ছে, বড় জানোয়ার কখন কখন ছোট হচ্ছে, লোপ পাচ্ছে; তেমনি মানুষ যে একটা সুসভ্য অবস্থায় ডুম্ করে জন্ম পেলে, এ কথা আর কেউ বড় বিশ্বাস করছে না।

পাশ্চাত্যমতে সমাজের ক্রমবিকাশ

বিশেষ এদের বাপ, দাদা, কাল না পরশু বর্ব্বর ছিল, তা থেকে অল্প দিনে এই কাণ্ড। কাজেই এরা বলছে যে, সমস্ত মানুষ ক্রমে ক্রমে অসভ্য অবস্থা থেকে উঠেছে এবং উঠছে। আদিম মানুষ কাঠ পাথরের যন্ত্রতন্ত্র দিয়ে কাজ চালাত, চামড়া বা পাতা পরে দিন কাটাত, পাহাড়ের গুহায় বা পাখীর বাসার মত কুঁড়ে ঘরে গুজরান করত। এর নিদর্শন সর্ব্বদেশের মাটির নীচে পাওয়া যাচ্ছে এবং কোনও কোনও স্থলে সে অবস্থার মানুষ স্বয়ং বর্ত্তমান। ক্রমে মানুষ ধাতু ব্যবহার করতে শিখলে, সে নরম ধাতু—টিন আর তামা। তাকে মিশিয়ে যন্ত্রতন্ত্র অস্ত্রশস্ত্র করতে শিখলে। প্রাচীন গ্রীক বাবিল মিশরীরাও অনেকদিন পর্য্যন্ত লোহার ব্যবহার

জানত না, যখন তারা অপেক্ষাকৃত সভ্য হয়েছিল, বই পত্র পর্য্যন্ত লিখত, সোণা রূপো ব্যবহার করত, তখন পর্য্যন্ত। আমেরিকা মহাদ্বীপের আদিম নিবাসীদের মধ্যে মেক্সিকো পেরু মায়া প্রভৃতি জাতি অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করত, সোণা রূপোর খুব ব্যবহার ছিল (এমন কি ঐ সোণা রূপোর লোভেই স্পানি লোকেরা তাদের ধ্বংস সাধন করলে)। কিন্তু সে সমস্ত কাজ চক্‌মকি পাথরের অস্ত্রদ্বারা অনেক পরিশ্রমে করতো, লোহার নাম গন্ধও জানতো না।

আদিম অবস্থায় মানুষ তীর ধনুক বা জালাদি উপায়ে জন্তু, জানোয়ার, মাছ মেরে খেত, ক্রমে চাষবাস শিখলে, পশুপালন করতে শিখলে। বনের জানোয়ারকে বশে এনে নিজের কাজ করতে লাগলো। অথবা সময়মত আহারেরও জন্য জানোয়ার পালতে লাগলো। গরু, ঘোড়া, শূকর, হাতি, উট, ভেড়া, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি পশু-পক্ষী মানুষের গৃহপালিত হতে লাগলো! এর মধ্যে কুকুর হচ্ছেন মানুষের আদিম বন্ধু।

আদিম অবস্থায় মানুষ মৃগয়াজীবী

আবার চাষবাস আরম্ভ হলো। যে ফল-মূল শাক-সব্‌জি ধান-চাল মানুষে খায়, তার বুনো অবস্থা আর এক রকম। এ মানুষের যত্নে বুনো ফল বুনো ঘাস, নানাপ্রকার সুখাদ্য বৃহৎ ও উপাদেয়

পরে কৃষিজীবী

ফলে পরিণত হলো। প্রকৃতিতে আপনা আপনি দিনরাত অদল বদল ত হচ্ছেই। নানাজাতের বৃক্ষলতা পশুপক্ষী শরীরসংসর্গে দেশ-কাল-পরিবর্ত্তনে নবীন নবীন জাতির সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু মানুষ-সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতি ধীরে ধীরে তরুলতা, জীবজন্তু বদলাচ্ছিলেন, মানুষ জন্মে অবধি সে হুড়মুড় করে বদলে দিতে লাগলো। সাঁ সাঁ করে এক দেশের গাছপালা জীবজন্তু অন্য দেশে মানুষ নিয়ে যেতে লাগলো, তাদের পরস্পর মিশ্রণে নানাপ্রকার অভিনব জীব-জন্তুর, গাছপালার জাত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হতে লাগলো।

বিবাহের আদিতত্ত্ব

আদিম অবস্থায় বিবাহ থাকে না, ক্রমে ক্রমে যৌন-সম্বন্ধ উপস্থিত হল। প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ সর্ব্বসমাজে মায়ের উপর ছিল। বাপের বড় ঠিকানা থাকতো না। মায়ের নামে ছেলেপুলের নাম হত। মেয়েদের হাতে সমস্ত ধন থাকতো ছেলে মানুষ করবার জন্য। ক্রমে ধন-পত্র পুরুষের হাতে গেল, মেয়েরাও পুরুষের হাতে গেল। পুরুষ বল্লে, 'যেমন এ ধনধান্য আমার, আমি চাষবাস করে বা লুঠতরাজ করে উপার্জ্জন করেছি, এতে যদি কেউ ভাগ বসায় ত আমি বিরোধ করবো', তেমনি বল্লে, 'এ মেয়েগুলো আমার, এতে যদি কেউ হস্তার্পণ করে ত বিরোধ হবে।' বর্ত্তমান বিবাহের সূত্রপাত হলো। মেয়েমানুষ, পুরুষের ঘটি বাটি গোলাম প্রভৃতি অধিকারের ন্যায় হলো।

প্রাচীন রীতি—একদলের পুরুষ অন্যদলে বে করত। সে বিবাহও জবরদস্তি—মেয়ে ছিনিয়ে এনে। ক্রমে সে কাড়াকাড়ি বদলে গেল, স্বেচ্ছায় বিবাহ চললো; কিন্তু সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস থাকে। এখনও প্রায় সর্ব্বদেশে বরকে একটা নকল আক্রমণ করে। বাঙ্গালাদেশে, ইউরোপে চাল দিয়ে বরকে আঘাত করে, পশ্চিমাঞ্চলে কনের আত্মীয় মেয়েরা বরযাত্রীদের গালিগালাজ করে ইত্যাদি।

সমাজ সৃষ্টি হতে লাগল। দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করত, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা নির্ব্বাহ করত; যারা সমতল জমিতে, তাদের চাষবাস; যারা পার্ব্বত্য দেশে, তারা ভেড়া চরাত; যারা মরুময় দেশে, তারা ছাগল উট চরাতে লাগলো; কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস করে শিকার করে খেতে লাগলো। যারা সমতল দেশ পেলে, চাষবাস শিখলে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগলো। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্ব্বল হতে লাগলো। যাদের শরীর দিনরাত খোলা হাওয়ায় থাকে, মাংসপ্রধান আহার তাদের; আর যারা ঘরের মধ্যে বাস করে, শস্যপ্রধান আহার; অনেক পার্থক্য হতে লাগলো।

কৃষিজীবীদের ও মৃগয়াজীবী অসুরের সম্বন্ধ

শিকারী বা পশুপাল বা মৎস্যজীবী আহারে অনটন হলেই ডাকাত বা বোম্বেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুঠতে আরম্ভ করলে। সমতলবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য, ঘনদলে সন্নিবিষ্ট হতে লাগলো, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হতে লাগলো।

দেবতারা ধান চাল খায়, সুসভ্য অবস্থা, গ্রাম, নগর, উদ্যানে বাস, পরিধান বোনা কাপড়; আর অসুরদের পাহাড় পর্ব্বত, মরুভূমি বা সমুদ্রতটে বাস, আহার বন্য জানোয়ার, বন্য ফলমূল, পরিধান ছাল; আর বুনো জিনিস বা ভেড়া, ছাগল, গরু দেবতাদের কাছ থেকে, বিনিময়ে যা ধানচাল। দেবতার শরীর শ্রম সহিতে পারে না, দুর্ব্বল। অসুরের শরীর উপবাস, কৃচ্ছ্র, কষ্ট-সহনে বিলক্ষণ পটু।

অসুরের আহারাভাব হলেই, দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্রকূল হতে, গ্রাম নগর লুঠতে এল। কখনও বা ধনধান্যের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগলো। দেবতারা বহুজন একত্র না হতে পারলেই অসুরের হাতে মৃত্যু; আর দেবতার বুদ্ধি প্রবল হয়ে নানাপ্রকার যন্ত্রতন্ত্র নির্ম্মাণ করতে লাগলো। ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র সব দেবতাদের; অসুরের সাধারণ অস্ত্র, কিন্তু গায়ে বিষম বল। বারংবার অসুর দেবতাদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু অসুর সভ্য হতে জানে না। চাষবাস করতে পারে না, বুদ্ধি চালাতে জানে না। বিজয়ী অসুর যদি বিজিত

দেবতাদের স্বর্গে রাজ্য করতে চায় ত সে কিছুদিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধিকৌশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে। নতুবা অসুর লুঠ করে সরে আপনার স্থানে যায়। দেবতারা যখন একত্রিত হয়ে অসুরদের তাড়ায়, তখন হয় তাদের সমুদ্র মধ্যে তাড়ায়, না হয় পাহাড়ে, না হয় জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয়। ক্রমে দু দিকেই দল বাড়তে লাগলো, লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগলো, লক্ষ লক্ষ অসুর একত্র হতে লাগলো। মহাসংঘর্ষ, মেশামেশি, জেতাজিতি চলতে লাগলো। এ সব রকমের মানুষ মিলেমিশে বর্ত্তমান সমাজ, বর্ত্তমান প্রথাসকলের সৃষ্টি হতে লাগলো, নানা রকমে নূতন ভাবের সৃষ্টি হতে লাগলো, নানা বিদ্যার আলোচনা চললো। একদল লোক ভোগোপ-যোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগলো—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেই সব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগলো। সকলে মিলে সেই সব বিনিময় করতে লাগলো, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ জায়গার জিনিসটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম ; যে

রাজা, বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তিরহস্য

পাহারা দিলে, সে জুলুম করে কতকটা আগ ভাগ নিলে; অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো!! পাহারাওয়ালার নাম হলো রাজা, মুটের নাম হলো সওদাগর। এ দু দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিস তৈরী করতে লাগল, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ডাকতে লাগলো।

ক্রমে এই সকল ভাব প্যাঁচাপেঁচি, মহা গেরোর উপর গেরো, তস্য গেরো হয়ে বর্ত্তমান মহা জটিল সমাজ উপস্থিত হলেন। কিন্তু ছিট মরে না। যেগুলো পূর্ব্ব জন্মে ভেড়া চরাত, মাছ ধরে খেত, সেগুলো সভ্য-জন্মে বম্বেটে ডাকাত প্রভৃতি হতে লাগলো। বন নেই যে সে শিকার করে; কাছে পাহাড় পর্ব্বতও নেই যে ভেড়া চরায়; জন্মের দরুণ শিকার বা ভেড়া চরাণ বা মাছ ধরা কোনটারই সুবিধা পায় না—সে কাজেই ডাকাতি করে, চুরি করে, সে যায় কোথায়? সে প্রাতঃ-স্মরণীয়াদের কালের মেয়ে, এ জন্মে ত আর এক সঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাজেই হয় বেশ্যা। ইত্যাদি রকমে নানা ঢঙের, নানা ভাবের, নানা সভ্য অসভ্য, দেবতা অসুর জন্মের মানুষ একত্র হয়ে হয়েছে সমাজ। কাজেই সকল সমাজে এই নানারূপে ভগবান বিরাজ কচ্ছেন।

দস্যু ও বেশ্যার উৎপত্তি

সাধু নারায়ণ, ডাকাত নারায়ণ, ইত্যাদি। আবার যে সমাজে যে দলে সংখ্যায় অধিক, সে সমাজের চরিত্র সেই পরিমাণে দৈবী বা আসুরী হতে লাগলো।

জম্বুদ্বীপের তামাম্ সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্ব্বর ভূমিতে উৎপন্ন—ইয়ংচিকিয়ং গঙ্গা সিন্ধু ইউফ্রেটিস-তীর। এ সকল সভ্যতারই আদ্ ভিত্তি চাষবাস। এ সকল সভ্যতাই দেবতাপ্রধান। আর ইউরোপের সকল সভ্যতাই প্রায় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্রময় দেশে জন্মেছে—ডাকাত আর বম্বেটে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অসুর-ভাব অধিক।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন ভিত্তি

বর্ত্তমান কালে যতদূর বোঝা যায়, জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগ ও আরবের মরুভূমি অসুরদের প্রধান আড্ডা। ঐ স্থান হতে একত্র হয়ে পশুপাল মৃগয়াজীবী অসুরকুল, সভ্য দেবতাদের তাড়া দিয়ে, দুনিয়াময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইউরোপখণ্ডের আদিমনিবাসী এক জাত অবশ্য ছিল। তারা পর্ব্বতগহ্বরে বাস করত; যারা ওর মধ্যে একটু বুদ্ধিমান তারা অল্প গভীর তলাওয়ের জলে খোঁটা পুঁতে মাচান বেঁধে, সেই মাচানের ওপর ঘর-দোর নির্ম্মাণ করে বাস করত। চক্‌মকি পাথরের তীর, বর্ষার ফলা, চক্‌মকির ছুরি ও পরশু দিয়ে সমস্ত কাজ চালাত।

ক্রমে জম্বুদ্বীপের নরস্রোত ইউরোপের উপর পড়্‌তে লাগলো। কোথাও কোথাও অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতের অভ্যুদয় হলো; রুশদেশান্তর্গত কোনও জাতির ভাষা ভারতের দক্ষিণী ভাষার অনুরূপ।

কিন্তু এ সকল জাত বর্ব্বর, অতি বর্ব্বর অবস্থায় রইল। আসিয়া মাইনর হতে একদল সুসভ্য মানুষ সন্নিকট দ্বীপপুঞ্জে উদয় হল, ইউরোপের সন্নিকট স্থান অধিকার করলে, নিজেদের বুদ্ধি আর প্রাচীন মিশরের সাহায্যে এক অপূর্ব্ব সভ্যতা সৃষ্টি করলে; তাদের আমরা বলি যবন, ইউরোপীরা বলে গ্রীক।

গ্রীক

পরে ইতালীতে রোমক নামক অন্য এক বর্ব্বর জাতি, ইট্রস্‌কান্ নামক এক সভ্য জাতিকে পরাভূত করে, তাদের বুদ্ধিবিদ্যা সংগ্রহ করে নিজেরা সভ্য হল। ক্রমে রোমকেরা চারিদিক অধিকার করলে; ইউরোপখণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের যাবতীয় অসভ্য মানুষ তাদের প্রজা হল। কেবল উত্তরভাগে বনজঙ্গলে বর্ব্বর জাতিরা স্বাধীন রইল। কালবশে রোম ঐশ্বর্য্য-বিলাসপরতায় দুর্ব্বল হতে লাগল; সেই সময় আবার জম্বুদ্বীপ অসুরবাহিনী ইউরোপের উপর নিক্ষেপ করলে। অসুর তাড়নায় উত্তর-ইউরোপী বর্ব্বর রোমসাম্রাজ্যের উপর পড়্‌লো! রোম উৎসন্ন হয়ে গেল। জম্বুদ্বীপের তাড়ায়

ইউরোপী জাতের সৃষ্টি

ইউরোপের বর্ব্বর আর ইউরোপের ধ্বংসাবশিষ্ট রোমক-গ্রীক মিলে এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হলো ; এ সময় য়াহুদীজাতি রোমের দ্বারা বিজিত ও বিতাড়িত হয়ে ইউরোপময় ছড়িয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নূতন ধর্ম্ম কৃশ্চানীও ছড়িয়ে পড়লো। এই সকল বিভিন্ন জাত, মত, পথ নানাপ্রকারের অসুরকুল, মহামায়ার মুচিতে, দিবারাত্র যুদ্ধ মারকাটের আগুনে গলে মিশতে লাগলো ; তা হতেই এই ইউরোপী জাতের সৃষ্টি।

হিঁদুর কাল রঙ্ থেকে, উত্তরে দুধের মত সাদা রঙ্, কাল, কটা, লাল বা সাদা চুল, কাল চোখ, কটা চোখ, নীল চোখ, দিব্যি হিঁদুর মত নাক মুখ চোখ, বা জাঁতামুখো চীনেরাম, এই সকল আকৃতিবিশিষ্ট এক বর্ব্বর, অতি বর্ব্বর ইউরোপী জাতির সৃষ্টি হয়ে গেল। কিছুকাল তারা আপনা আপনি মারকাট করতে লাগলো ; উত্তরেরগুলো বম্বেটে-রূপে বাগে পেলেই অপেক্ষাকৃত সভ্যগুলোর উৎসাদন করতে লাগল। মাঝখান থেকে, কৃশ্চান ধর্ম্মের দুই গুরু, ইতালীর পোপ (ফরাসী, ইতালী ভাষায় বলে 'পাপ') আর পশ্চিমে কনষ্টান্টিনোপল্‌সের পাট্রিয়ার্ক, এরা এই জন্তুপ্রায় বর্ব্বর বাহিনীর উপর, তাদের রাজারাণী সকলের উপর কর্ত্তাত্তি চালাতে লাগলো।

এদিকে আবার আরব মরুভূমে মুসলমানি ধর্ম্মের উদয়

হল। বন্যপশুপ্রায় আরব এক মহাপুরুষের প্রেরণাবলে অদম্য তেজে, অনাহত বলে, পৃথিবীর উপর আঘাত করলে। পশ্চিম পূর্ব্ব দুপ্রান্ত হতে সে তরঙ্গ ইউরোপে প্রবেশ করলে। সে স্রোতমুখে ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের বিদ্যাবুদ্ধি ইউরোপে প্রবেশ করতে লাগলো।

মুসলমান ধর্ম্ম

জম্বুদ্বীপের মাঝখান হতে সেলমুল তাতার নামক অসুর জাতি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে আসিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থান দখল করে ফেললে। আরাবরা ভারতবর্ষ জয়ের অনেক চেষ্টা করেও সফল হয় নি! মুসলমান-অভ্যুদয় সমস্ত পৃথিবী বিজয় করেও ভারতবর্ষের কাছে কুণ্ঠিত হয়ে গেল। সিন্ধুদেশ একবার আক্রমণ করেছিল মাত্র, কিন্তু রাখতে পারে নি; তারপর থেকে আর উদ্যম করে নি।

মুসলমানের ভারতাদি বিজয়

কয়েক শতাব্দীর পর যখন তুর্ক প্রভৃতি তাতার জাতি বৌদ্ধধর্ম্ম ছেড়ে মুসলমান হলো, তখন এই তুর্কিরা সমভাবে হিন্দু, পার্শী, আরাব, সকলকে দাস করে ফেললে। ভারত-বর্ষের সমস্ত মুসলমান বিজেতার মধ্যে একদলও আরবি বা পার্শী নয়, সব তুর্কাদি তাতার। রাজপুতানায় সমস্ত আগন্তুক মুসলমানের নাম তুর্ক—তাই সত্য, ঐতিহাসিক। রাজপুতানার চারণ যে গাইলেন, 'তুরুগণকো বড়ি জোর',

তাই ঠিক। কুতুবউদ্দিন হতে মোগল বাদ্‌সাই পর্য্যন্ত, ও সব তাতার, যে জাত তিব্বতি, সেই জাত; কেবল হয়েছেন মুসলমান, আর হিঁদু পার্শী বে করে বদলেছেন চাকামুখ। ও সেই প্রাচীন অসুর বংশ। আজও কাবুল, পারস্য, আরব্য, কল্‌ষ্টান্টিনোপোলে সিংহাসনে বসে রাজত্ব কচ্ছেন সেই অসুর তাতার; গান্ধারি, ফারসি, আরাব সেই তুরস্কের গোলামি কচ্ছেন। বিরাট চীনসাম্রাজ্যও সেই তাতার মাঞ্চুর পদতলে, তবে সে মাঞ্চু নিজের ধর্ম্ম ছাড়ে নি, মুসলমান হয় নি, মহালামার চেলা। এ অসুর জাত কস্মিন্‌কালে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চ্চা করে না, জানে মাত্র লড়াই। ও রক্ত না মিশলে, যুদ্ধবীর্য্য বড় হয় না। উত্তর ইউরোপ, বিশেষ রুশের প্রবল যুদ্ধবীর্য্য সেই তাতার। রুশ তিন হিস্সে তাতার রক্ত। দেবাসুরের লড়াই এখনও চলবে অনেক কাল। দেবতা অসুরকন্যা বে করে, অসুর দেবকন্যা ছিনিয়ে নেয়,—এই রকম করে প্রবল খিচুড়ি জাতের সৃষ্টি হয়।

তাতাররা আরবি খলিফার সিংহাসন কেড়ে নিলে, কৃশ্চানদের মহাতীর্থ জিরুসালম্‌ প্রভৃতি স্থান দখল করে কৃশ্চানদের তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দিলে, অনেক কৃশ্চান মেরে ফেললে। কৃশ্চান ধর্ম্মের গুরুরা ক্ষেপে উঠল; ইউরোপময় তাদের সব বর্ব্বর চেলা; রাজা প্রজাকে ক্ষেপিয়ে তুললে,

—পালে পালে ইউরোপী বর্ব্বর জিরুসালম্ উদ্ধারের জন্য আসিয়া মাইনরে চললো। কতক নিজেরাই কাটাকাটি করে মলো, কতক রোগে মলো, বাকি মুসলমানে মারতে লাগলো। সে ঘোর বর্ব্বর ক্ষেপে উঠেছে,—মুসলমানেরা যত মারে তত আসে। সে বুনোর গোঁ। আপনার দলকেই লুঠছে, খাবার না পেলে মুসলমান ধরেই খেয়ে ফেললে। ইংরেজ রাজা রিচার্ড মুসলমানমাংসে বিশেষ খুসী ছিলেন, প্রসিদ্ধি আছে।

কৃশ্চান-মুসলমান দ্বন্দ্ব

বুনো মানুষ, আর সভ্য মানুষের লড়ায়ে যা হয়, তাই হল,—জিরুসালম্ প্রভৃতি অধিকার করা হলো না। কিন্তু ইউরোপ সভ্য হতে লাগলো। সে চামড়া পরা, আম-মাংসখেকো বুনো ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান প্রভৃতি আসিয়ার সভ্যতা শিখতে লাগলো! ইতালী প্রভৃতি স্থানের নাগা ফৌজ দার্শনিক মত শিখতে লাগল; এক-দল কৃশ্চান নাগা (Knights-Templars) ঘোর অদ্বৈতবেদান্তী হয়ে উঠলো; শেষে তারা কৃশ্চানীকে ঠাট্টা করতে লাগলো, এবং তাদের ধনও অনেক সংগৃহীত হয়েছিল; তখন পোপের হুকুমে, ধর্ম্ম-রক্ষার ভানে ইউরোপী রাজারা তাদের নিপাত করে ধন লুটে নিলে।

ফলে ইউরোপে সভ্যতার প্রবেশ

এদিকে মুর নামক মুসলমান জাতি স্পান দেশে অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন করলে, নানাবিদ্যার চর্চ্চা করলে, ইউরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটি হলো; ইতালী, ফ্রাঁস, সুদূর ইংলণ্ড হতে বিদ্যার্থী বিদ্যা শিখতে এলো; রাজ-রাজড়ার ছেলেরা যুদ্ধবিদ্যা, আচার, কায়দা, সভ্যতা শিখতে এলো। বাড়ী, ঘর, দোর, মন্দির সব নূতন ঢঙে বনতে লাগলো।

ইউরোপ এক মহা সেনানিবাসে পরিণত

কিন্তু সমগ্র ইউরোপ হয়ে দাঁড়াল এক মহা সেনা-নিবাস—সে ভাব এখনও। মুসলমানেরা একটা দেশ জয় করে, রাজা আপনার এক বড় টুকরা রেখে বাকি সেনাপতিদের বেঁটে দিতেন। তারা খাজনা দিত না, কিন্তু রাজার আবশ্যক হলেই এতগুলি সৈন্য দিতে হবে। এই রকমে সদা প্রস্তুত ফৌজের অনেক হাঙ্গামা না রেখে, আবশ্যককালে-হাজির প্রবল ফৌজ প্রস্তুত রইল। আজও রাজপুতানায় সে ভাব কতক আছে;—ওটা মুসলমানেরা এদেশে আনে। ইউরোপীরা মুসলমানের এভাব নিলে। কিন্তু মুসলমানদের ছিল রাজা, সামন্তচক্র, ফৌজ ও বাকি প্রজা। ইউরোপে রাজা সামন্তচক্র আর বাকি সব প্রজাকে করে ফেললে এক রকম গোলাম। প্রত্যেক মানুষ কোনও সামন্তের অধিকৃত মানুষ হয়ে, তবে জীবিত রইল—হুকুম মাত্রেই প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধ-যাত্রায় হাজির হতে হবে।

ইউরোপী সভ্যতা নামক বস্ত্রের এই সব হলো উপকরণ। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ী সমুদ্রতটময় প্রদেশ ; এর তুলো হচ্ছে—সর্ব্বদা যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ, নানা-জাতের মিশ্রণে এক মহা খিচুড়ি জাত। এর টানা হচ্ছে—যুদ্ধ ; আত্মরক্ষার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। যে তলওয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড় ; যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে কোনও বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবনধারণ করে। এর পোড়েন—বাণিজ্য। এ সভ্যতার উপায় তলওয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহপারলৌকিক ভোগ।

ইউরোপী সভ্যতা-বস্ত্রের উপাদান

আমাদের কথাটা কি ? আর্য্যরা শান্তিপ্রিয়, চাষবাস করে শস্যাদি উৎপন্ন করে, শান্তিতে স্ত্রী পরিবার পালন করতে পেলেই খুসী। তাতে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট ; কাজেই চিন্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক। আমাদের জনক রাজা স্বহস্তে লাঙ্গল চালাচ্ছেন এবং সে-কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মবিৎও তিনি। ঋষি, মুনি, যোগীর অভ্যুদয়—গোড়া থেকে ; তাঁরা প্রথম হতেই জেনেছেন যে, সংসারটা ধোঁকা, লড়াই কর আর লুঠই কর, ভোগ বোলে যা খুঁজছ তা আছে শান্তিতে, শান্তি আছেন শারীরিক ভোগ-বিসর্জ্জনে ;

আমাদের সভ্যতা শান্তিপ্রিয়

ভোগ আছেন, মনঃশীলতায়, বুদ্ধিচর্চ্চায়, শরীরচর্চ্চায় নেই। জঙ্গল আবাদ করা তাদের কাজ।

তারপর, প্রথমে সে পরিষ্কৃত ভূমিতে নির্ম্মিত হল যজ্ঞ-বেদী, উঠলো—সে নির্ম্মল আকাশে যজ্ঞের ধূম, সে বায়ুতে বেদমন্ত্র প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো, গবাদি পশু নিঃশঙ্কে চরতে লাগলো। বিদ্যাধর্ম্মের পায়ের নীচে তলওয়ার রইল। তার একমাত্র কাজ ধর্ম্মরক্ষা করা, মানুষ ও গবাদি পশুর পরিত্রাণ করা, বীরের নাম আপত্রাতা, ক্ষত্রিয়।

লাঙ্গল, তলওয়ার সকলের অধিপতি রক্ষক রইলেন, ধর্ম্ম। তিনি রাজার রাজা, জগৎ নিদ্রিত হলেও তিনি সদা জাগরূক। ধর্ম্মের আশ্রয়ে সকলে রইল স্বাধীন।

আর্য্যগণ কর্ত্তৃক ভারতীয় আদিম জাতিবিনাশ ইউরোপীদের ভিত্তিহীন অনুমানমাত্র

ঐ যে ইউরোপী পণ্ডিত বলছেন যে, আর্য্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের বুনোদের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন, ও সব আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শেখান হচ্ছে। এ অতি অন্যায়।

আমি মূর্খ মানুষ, যা বুঝি তাই নিয়েই এ পারি সভায় বিশেষ প্রতিবাদ করেছি। এদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করছি। সময় পেলে আরও সংশয় ওঠাবার

আশা আছে। এ কথা তোমাদেরও বলি—তোমরা পণ্ডিত-মনিষ্যি, পুঁথি পাতড়া খুঁজে দেখ।

ইউরোপীরা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা সুখে বাস করেন, অতএব আর্য্যেরাও তাই করেছে !! ওরা হা-ঘরে 'হা-অন্ন' 'হা-অন্ন' করে, কাকে লুঠবে, মারবে বলে ঘুরে বেড়ায়—আর্য্যেরাও তাই করেছে !! বলি, এর প্রমাণটা কোথায়—আন্দাজ ? ঘরে তোমার আন্দাজ রাখগে।

কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখছ যে, আর্য্যেরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে ? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন ? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি ? আর রামায়ণ পড়া ত হয় নি,—খামকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপর কেন বানাচ্ছ ?

রামায়ণ কিনা আর্য্যদের দক্ষিণী বুনো বিজয় !! বটে—রামচন্দ্র আর্য্য রাজা, সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে ? লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং, কম ত নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হলো কোথায় ? তারা হলো সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্

রামায়ণ আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক অনার্য্য-বিজয়ের উপাখ্যান নহে

গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বল না ?

হতে পারে দু এক জায়গায় আর্য্য আর বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে, হতে পারে দু একটা ধূর্ত্ত মুনি রাক্ষসদের জঙ্গলের মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। মট্‌কা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে, কখন রাক্ষসেরা ঢিল ঢেলা হাড়গোড় ছোঁড়ে। যেমন হাড়গোড় ফেলা, অমনি নাকিকান্না ধরে রাজাদের কাছে গমন। রাজারা লোহার জামাপরা, লোহার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়া চড়ে এলেন ; বুনো হাড় পাথর ঠেঙ্গা নিয়ে কতক্ষণ লড়বে ? রাজারা মেরে ধরে চলে গেল। এ হতে পারে ; কিন্তু এতেও বুনোদের জঙ্গল কেড়ে নিয়েছে, কোথায় পাচ্ছ ?

অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান সমতল ক্ষেত্র—আর্য্যসভ্যতার তাঁত। আর্য্যপ্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমাচার, এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ-নিবারণ।

তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ ? অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায় ? যেখানে দুর্ব্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ, তাদের

উপসংহার

জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি ? তোমাদের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, প্যাসিফিক্ দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিকা ?

কোথা সে সকল বুনো জাত আজ ? একেবারে নিপাত, বন্য পশুবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ,—যেখানে তোমাদের শক্তি নাই, সেথা মাত্র অন্য জাত জীবিত।

আর ভারতবর্ষ তা কস্মিন্‌কালেও করেন নি। আর্য্যেরা অতি দয়াল ছিলেন। তাঁদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদয়ে, অমানব-প্রতিভাসম্পন্ন মাথায়, ওসব আপাতরমণীয় পাশব প্রণালী কোনও কালেও স্থান পায় নি। স্বদেশী আহাম্মক ! যদি আর্য্যরা বুনোদের মেরে ধরে বাস করত, তা হলে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি কি হত ?

ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ কোরে, আমরা বেঁচে থাকবো। আর্য্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করবো, আমাদের চেয়ে বড় করবো। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার ; আর্য্যের উপায়—বর্ণবিভাগ। শিক্ষা, সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান, বর্ণ-বিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্ব্বলের মৃত্যু ; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য।

ইউরোপীরা যার এত বড়াই করে, সে 'সভ্যতার উন্নতি'র (Progress of Civilization) মানে কি? তার মানে এই যে—সিদ্ধি, অনুচিতকে উচিত করে। চুরি, মিথ্যা, অথবা Stanley দ্বারা সমভিব্যাহারী ক্ষুধার্ত্ত মুসলমান রক্ষী-দের এক গ্রাস অন্ন চুরি করার দরুণ চাব্‌কান এবং ফাঁসী, এসকলের ঔচিত্য বিধান করে, 'দূর হও, আমি ওথায় আসতে চাই'-রূপ বিখ্যাত ইউরোপী নীতি—যার দৃষ্টান্ত, যেথায় ইউরোপী-আগমন, সেথাই আদিম জাতির বিনাশ—সেই নীতির ঔচিত্য বিধান করে! এই সভ্যতার অগ্রসরণ লণ্ডন নগরীতে ব্যভিচারকে, এবং পারিতে স্ত্রীপুত্রাদিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালান এবং আত্মহত্যা করাকে 'সামান্য ধৃষ্টতা' জ্ঞান করে—ইত্যাদি।

কৃশ্চানী ও ইসলামী ধর্ম্মে মানবজাতির উন্নতির সম্বন্ধে তুলনা

এখন ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী ক্ষিপ্র সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে কৃশ্চানধর্ম্মের প্রথম তিন শতাব্দীর তুলনা কর। কৃশ্চানধর্ম্ম প্রথম তিন শতাব্দীতে জগৎসমক্ষে আপনাকে পরিচিত কর্ত্তেও সমর্থ হয় নি, এবং যখন Constantineএর তলওয়ার একে রাজ্যমধ্যে স্থান দিলে, সেদিন থেকে কোন্ কালে কৃশ্চানী ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক সভ্যতাবিস্তারের কোন্ সাহায্য করেছে? যে ইউরোপী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সচলা,

কৃশ্চানধর্ম্ম তাঁর কি পুরস্কার দিয়েছিল? কোন্ বৈজ্ঞানিক কোন্ কালে কৃশ্চানী ধর্ম্মের অনুমোদিত? কৃশ্চানী সঙ্ঘের সাহিত্য কি দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিজ্ঞানের, শিল্প বা পণ্য-কৌশলের অভাব পূরণ করতে পারে? আজ পর্য্যন্ত 'চর্চ্চ' প্রোফেন (ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়াবলম্বনে লিখিত) সাহিত্য-প্রচারে অনুমতি দেন না। আজ যে মনুষ্যের বিদ্যা এবং বিজ্ঞানে প্রবেশ আছে, তার কি অকপট কৃশ্চান হওয়া সম্ভব? New Testamentএ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরান বা হদিশের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়। ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান মনীষিগণ ইউরোপের ভলটেয়ার, ডারউইন, বুকনার, ফ্লমারিয়ণ, ভিক্টর হুগো-কুল বর্ত্তমানকালে কৃশ্চানী দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত; অপরদিকে এই সকল পুরুষকে ইস্‌লাম বিবেচনা করেন যে, এই সকল পুরুষ আস্তিক, কেবল ইহাদের পয়গম্বর-বিশ্বাসের অভাব। ধর্ম্ম-সকলের উন্নতির বাধকত্ব বা সহায়কত্ব বিশেরূপে পরীক্ষিত হউক, দেখা যাইবে, ইস্‌লাম যেথায় গিয়াছে, সেথায়ই আদিমনিবাসীদের রক্ষা করেছে। সে সব জাত সেথায় বর্ত্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্ত্তমান।

কৃশ্চানধর্ম্ম কোথায় এমন কাজ দেখাতে পারে?

স্পেনের আরাব, অষ্ট্রেলিয়ার এবং আমেরিকার আদিম-নিবসীরা কোথায় ? কৃশ্চানেরা ইউরোপী য়াহুদীদের কি দশা এখন করছে ? এক দানসংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী ছাড়া ইউরোপের আর কোনও কার্য্যপদ্ধতি, গস্‌পেলের অনুমোদিত নয়—গস্‌পেলের বিরুদ্ধে সমুত্থিত। ইউরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই কৃশ্চানধর্ম্মের বিপক্ষে—বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ইউরোপে কৃশ্চানীর শক্তি থাকৃত, তাহলে 'পাস্তের' এবং 'ককে'র ন্যায় বৈজ্ঞানিক সকলকে জীবন্ত পোড়াত; এবং ডারউইনকল্পদের শূলে দিত। বর্ত্তমান ইউরোপে কৃশ্চানী আর সভ্যতা আলাদা জিনিস। সভ্যতা, এখন তার প্রাচীন শত্রু কৃশ্চানীর বিনাশের জন্য, পাদ্রিকুলের উৎসাদনে এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং দাতব্যালয়সকল কেড়ে নিতে কটিবদ্ধ হয়েছে। যদি মূর্খ চাষার দল না থাকত, তাহলে কৃশ্চানী তার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ করতে সমর্থ হত না এবং সমূলে উৎপাটিত হত ; কারণ, নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই কৃশ্চানী ধর্ম্মের প্রকাশ্য শত্রু ! এর সঙ্গে ইসলামের তুলনা কর। মুসলমান দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলাম ধর্ম্মের উপরে সংস্থাপিত এবং ইসলামের ধর্ম্মশিক্ষকেরা, সমস্ত রাজকর্ম্মচারীদের বহুপূজিত এবং অন্য ধর্ম্মের শিক্ষকেরাও সম্মানিত।

পাশ্চাত্যদেশে লক্ষ্মী সরস্বতীর এখন কৃপা একত্রে। শুধু ভোগের জিনিস সংযোগ হলেই এরা ক্ষান্ত নয়, কিন্তু সকল কাজেই একটু সুচ্ছবি চায়। খাওয়া-দাওয়া ঘর-দোর সমস্তই একটু সুচ্ছবি দেখতে চায়। আমাদের দেশেও ঐ ভাব একদিন ছিল, যখন ধন ছিল! এখন একে দারিদ্র্য তার ওপর আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হয়ে যাচ্ছি। জাতীয় যে গুণগুলি ছিল তাও যাচ্ছে—পাশ্চাত্যদেশেরও কিছুই পাচ্ছি না! চলাবসা কথাবার্ত্তায় একটা সেকেলে কায়দা ছিল, তা উৎসন্ন গেছে, অথচ পাশ্চাত্য কায়দা নেবারও সামর্থ্য নেই। পূজা পাঠ প্রভৃতি যা কিছু ছিল, তা ত আমরা বানের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি,—অথচ কালের উপযোগী একটা নূতন রকমের কিছু এখনও হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, আমরা এই মধ্যরেখার দুর্দ্দশায় এখন পড়ে। ভবিষ্যৎ বাঙ্গলাদেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায় নি। বিশেষ দুর্দ্দশা হয়েছে শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোর আল্‌পোনা দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র করত। বাহার কোরে কলাপাতা কাট্‌ত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার শিল্পচাতুরীতে সাজাত, সে সব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র!! নূতন অবশ্য শিখতে হবে, কর্ত্তে হবে কিন্তু তা বলে কি পুরোণগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না কি? নূতন ত শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি!! কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনও

দূর পাড়াগাঁয়ে পুরোণ কাঠের কাজ, ইটের কাজ, দেখে এসগে। কলকেতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্য্যন্ত গড়তে পারে না। দোর কি আগড় বোঝবার জো নেই !!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতি যন্ত্র কেনা !! এই অবস্থা সর্ব্ববিষয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের যা ছিল তা ত সব যাচ্ছে, অথচ বিদেশী শেখবার মধ্যে বাক্যি-যন্ত্রণা মাত্র !! খালি পুঁথি পড়ছ আর পুঁথি পড়ছ! আমাদের বাঙ্গালী আর বিলেতে আইরিস, এ দুটো এক ধাতের জাত। খালি বকাবকি করছে। বক্তৃতায় এ দুজাত বেজায় পটু। কাজের—এক পয়সাও নয়—বাড়ার ভাগ দিনরাত পরস্পারে খেয়োখেয়ি কোরে মরছে !!!

পরিষ্কার সাজান গোজান এ দেশের এমন অভ্যাস যে অতি গরীব পর্য্যন্তরও ওবিষয়ে নজর। আর নজর কাজেই হতে হয়—পরিষ্কার কাপড় চোপড় না হলে তাকে যে কেউ কাজ কর্ম্মই দেবে না। চাকরচাকরাণী, রাঁধুনি সব ধপ্-ধপে কাপড়—দিবারাত্র। ঘরদোর ঝেড়েঝুড়ে, ঘসেমেজে, ফিট্‌ফাট্। এদের প্রধান সায়েস্তা এই যে, যেখানে সেখানে যা তা কখনও ফেলবে না! রান্নাঘর ঝক্‌ঝকে—কুট্‌নো ফুট্‌নো যা ফেলবার তা একটা পাত্রে ফেলছে, তারপর সেখান হতে দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। উঠানেও ফেলে না। রাস্তায়ও ফেলে না।

যাদের ধন আছে তাদের বাড়ীঘর ত দেখবার জিনিস—দিনরাত সব ঝক্‌ঝক্! তার ওপর নানাপ্রকার দেশবিদেশের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করেছে! আমাদের এখন ওদের মত শিল্প-সংগ্রহে কাজ নেই, কিন্তু যেগুলো উৎসন্ন যাচ্ছে, সেগুলোকে একটু যত্ন কর্ত্তে হবে? না—না? ওদের মত চিত্র বা ভাস্কর্য্য বিদ্যা হতে আমাদের এখনও ঢের দেরী! ওদুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। আমাদের ঠাকুরদেবতা সব দেখ না, জগন্নাথেই মালুম!! বড্ড জোর ওদের (ইউরোপীদের) নকল কোরে একটা আধটা রবিবর্ম্মা দাঁড়ায়!! তাদের চেয়ে দিশী চালচিত্রি করা পোটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝক্‌ঝকে রঙ্ আছে। ওসব রবিবর্ম্মা ফর্ম্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়!! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল। ইউরোপী ভাস্কর্য্য চিত্র প্রভৃতির কথা বারান্তরে উদাহরণ সহিত বলবার রইল। সে এক প্রকাণ্ড বিষয়।